বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নিতাই দাস

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নিতাই দাস

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অশোক কর্মকার

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৬

মূল্য : পনের টাকা

প্রকাশক : রঞ্জন কর্মকার, নয়াপল্টন, ঢাকা।

মুদ্রক : মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস প্রেস, ১৫৯, আরামবাগ, ঢাকা।

আব্বার ও
আম্মার স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

যাত্রা হলো শুরু	৯
রুদ্ধ দ্বারে সফল আঘাত	২১
স্বাধীনতার বীর সেনানী	৪১
দেশ গড়ার সংগ্রাম	৫৪
সংগ্রামের প্রশস্ত পথ	৭৩
পেছনে ফেলে আসা সংগ্রামী ঐতিহ্য (আলোকচিত্র)	

যাত্রা হলো শুরু

১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়। ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে জন্ম হয়েছিল এই সংগঠনের। পটভূমির বাস্তবতাই সংগঠনটির জন্ম অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

'মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র' এই বক্তব্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের প্রতিভূ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার মুসলিম লীগের শাসন কায়েম হয় হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুই ভূখণ্ডের দেশ—পাকিস্তানে। নতুন দেশে গণতন্ত্রহীন পরিবেশে বামপন্থীদের পীড়ন ছাড়াও মুসলীম লীগ শাসকরা জাতিগত নিপীড়নের পথ অনুসরণ করতে থাকে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আঘাত হানা হয় ভাষার ওপর। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে সরকারী ও শিক্ষার ভাষা করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের কার্যত সূত্রপাত হয়। অবশ্য পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলে আসছিল। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলায় তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে কয়েকদফা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘট পালন, সেক্রেটারিয়েট-এসেম্বলি ঘেরাও, গ্রেফতার-নির্যাতনের পর ১৫ মার্চ পূর্ব বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকার করে

নিতে বাধ্য হন। ছাত্র আন্দোলনের এই প্রাথমিক বিজয়ের পরও জিন্নাহ সাহেব ঢাকার রেসকোর্স ও কার্জন হলে উর্দুর পক্ষেই বক্তব্য হাজির করার পর এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আন্দোলন ব্যতীত বাঙালীর ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

এই সময়ে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে ফাটল ধরে। পূর্ব বাংলায় সরকার সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ভেঙ্গে নইমুদ্দিন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয় (৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮)। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ মুসলিম লীগের একাংশ মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। এই দু'টি সংগঠন শাসক মুসলিম লীগের গণস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি এই সংগঠন দু'টির মূল দাবি হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের দাবিও উত্থাপন করে। ইতিপূর্বে একমাত্র বিরোধীদল ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের উপর মুসলিম লীগ সরকার ছিল খড়গহস্ত। কিন্তু এ দু'টি সংগঠনের জন্মের ফলে মুসলিম লীগের শোষণের বিরুদ্ধে এ যাবৎকাল সংগ্রামরত কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রভৃতি সংগঠনের সংগ্রামের কাফেলায় নতুন শক্তির সংযোজন হলো। জাতীয় রাজনীতির এই বলিষ্ঠ ধারাটিও মুসলিম লীগ বিরোধী সংগ্রামের ধারায় যুক্ত হয়ে গেল।

ভাষা আন্দোলনের প্রশস্ততর পর্যায় শুরু হয় ১৯৫২ সালে। ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ঢাকায় মুসলিম লীগ সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে ছাত্র-জনতা। সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা পরিষদ গঠিত হয়—সভা-সমাবেশ, ধর্মঘট শুরু হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ৪ ফেব্রুয়ারি হয় ছাত্র ধর্মঘট। ২১ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' ও হরতাল।

২০ তারিখ সরকার জারী করে ১৪৪ ধারা। সরকারী বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় আমতলা থেকে ছাত্ররা ১০ জন করে রাস্তায় বের হয় ও গ্রেপ্তার বরণ করতে থাকে। এই অবস্থারই এক পর্যায়ে ছাত্রদের উপর চলে গুলি। শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করতে এগিয়ে আসে হাজার হাজার মানুষ। পরপর তিনদিন চলে ধর্মঘট-হরতাল। বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হলেও আন্দোলন থামে না—ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। গ্রেপ্তার হয় শত শত, তবুও আন্দোলন থামেনা—এগিয়ে আসে নতুন নতুন মুখ। ভাষার প্রশ্নে জেগে ওঠে গোটা পূর্ব বাংলা—মুসলিম লীগ বিচ্ছিন্ন হয় বাংলা থেকে, বাংলার মানুষের মন থেকে।

ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা

২১ ফেব্রুয়ারির পর ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত শত শত রাজ-নৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা দেশে প্রচুর ছাত্রকেও আটক করা হয়। অনেকের নামে জারী হয় হুলিয়া। গোটা পূর্ব বাংলা জুড়ে কায়েম হয় ত্রাসের রাজত্ব। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এপ্রিলের শেষভাগে ঢাকা শহরে সারা দেশের অগ্রেপ্তারকৃত ছাত্র নেতাদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলন পরিচালনার সমস্যা-সংকট ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কনভেনশনে উপস্থিত সকলে একমত হলেন, আন্দোলন এগিয়ে নিয়েই ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলা ভাষা কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়, তাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নির্বি-শেষে সকল বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠেই এ দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত ছাত্রদের কোন অসাম্প্রদায়িক সংগঠন ছিলনা। আন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মুসলিম ছাত্র লীগ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে দোদুল্যমানতা ও দৃঢ় চিত্তের অভাব প্রদর্শন করেছে। ভবিষ্যতে আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে তাই একটি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ-চিত্ত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—যার অন্যতম মূলনীতি হবে অসাম্প্রদায়িকতা।

এই প্রয়োজনীয়তা পূরণের তাগিদ থেকেই ২৬ এপ্রিল (১৯৫২) ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে গঠিত হলো একটি নতুন ছাত্র সংগঠন। পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামের এই ছাত্র সংগঠনটিই আজকের বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্রনেতা কাজী আনোয়ারুল আজীম ও সৈয়দ আবদুস সাত্তার হলেন এই নতুন ছাত্র সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক।

জন্মের সময়ে এই সংগঠনের মূল বক্তব্য ছিল ঃ

অসাম্প্রদায়িকতা ঃ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে সকল ছাত্রছাত্রীকে সংগঠিত করা।

দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ঃ আন্দোলন-সংগ্রামে আপসহীনভাবে ও দৃঢ়তা সহকারে সংগঠনকে অগ্রসর করে নিতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ঃ পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। তাই ছাত্র-জনতার সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে। ভাষাসহ মানুষের বিভিন্ন অধিকারের অন্যতম শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। তাই, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষ জরুরী।

জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ ভাষার উপর আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে জাতীয় অধিকারের ওপরই আক্রমণ। তাই আন্দোলন শুধু ভাষার দাবিতেই সীমিত রাখা চলবে না—জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের দিকেও এ সংগ্রামকে নিয়ে যেতে হবে।

গণতন্ত্র ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণতন্ত্রহীন পরিবেশ কায়েম করা হয়। মুসলীম লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরিবর্তে ছাত্র ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দাবি করে।

ছাত্র গণ-সংগঠন ঃ এ পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। ছাত্র সমাজকে আন্দোলনে সামিল করতে হলে রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে থেকে একটি সংগঠনের পতাকাতলে জমায়েত করা দরকার। এই ধরনের সংগঠন হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে

উঠুক—এই ছিল তখনকার ছাত্র নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা।

ভাষা আন্দোলনের ফলে ছাত্র সমাজের মধ্যে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে ধরনের সংগঠন প্রয়োজন সে ধরনের সংগঠনের চাহিদা পুরণ করতে প্রয়াসী হলো ছাত্র ইউনিয়ন। আন্দোলনের সময় যে ব্যাপক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হয়েছিল, তারাও বাস্তবতার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলো ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে। তাই দেখা গেল জন্মের অব্যবহিত পরেই ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ছাত্ররা দলে দলে আসতে থাকে এই সংগঠনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, বিভিন্ন হল সংসদের নেতৃবৃন্দ যোগ দিলেন ছাত্র ইউনিয়নে। মুসলিম ছাত্র লীগের অনেক নেতা ও কর্মীও এসে জড়ো হলেন। জেলখানা থেকে অনেক ছাত্র-নেতা একাত্মতা ঘোষণা করে বার্তা পাঠালেন। এভাবে জন্মলগ্নেই ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র সমাজের নিজস্ব সংগঠনে পরিণত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা থেকে যে সংগঠনের জন্ম, তা স্বাভাবিক-ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়। ছাত্র ফেডা-রেশনের মতোই ছাত্র ইউনিয়নকে বিভিন্ন অপপ্রচারের শিকার হতে হয়। 'ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিস্টদের সংগঠন—কমিউনিস্টরা দেশের শত্রু,' 'ছাত্র ইউনিয়ন ধর্মহীন'—ইত্যাদি অপপ্রচার সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়নের প্রসার রোধ হয়নি—ছাত্র ইউনিয়ন এগিয়ে যায় পাল তোলা নৌকার মতো উদ্দাম গতিতে আপন লক্ষ্যের অভিমুখে।

প্রথম সম্মেলন

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জন্মের পর ৮ মাসে তীব্র দমননীতির মধ্যেও ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটে। এই সম্মেলনে সংগঠনের নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষের চেতনার মান একরকম না, দুই অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজচেতনা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ইত্যাদি সবই আলাদা—তাই দুই স্থানের আন্দোলনও

সমভাবে অগ্রসর হতে পারেনা । এ কারণে পাকিস্তানভিত্তিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা ছিল কঠিন। এদিক বিবেচনা করে সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্মেলনে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। মোহাম্মদ সুলতানকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ ইলিয়াসকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

একুশে উদযাপন

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে ছাত্র ইউনিয়ন শহীদের পুণ্য স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। মেডিক্যাল কলেজের সামনে শহীদের রক্তরঞ্জিত স্থানে শহীদ মিনার গড়ে উঠল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের পেটোয়া বাহিনী তা ভেঙ্গে ফেলে। আবার গড়া হলো—আবার ভেঙ্গে ফেলা হলো। এভাবে ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়েই উদ্‌যাপিত হয় প্রথম একুশে। কালের পথ বেয়ে আজ সেই একুশে পরিণত হয়েছে জাতীয় শোক দিবসে। সংকলন প্রকাশ, প্রভাতফেরী করার ঐতিহ্যের শুরু সেই থেকে। ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করার পাশাপাশি একুশের সংগ্রামী আবেদনকে ধরে রাখার কাজেও ছাত্র ইউনিয়ন পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা।

আন্দোলন-নির্বাচন

ভাষা আন্দোলনের সময় যেসব রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদেরকে মুক্ত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার বন্দীদের অনেককে ছাড়তে বাধ্য হয়। ১৯৫৩ সালে ছাত্র বেতন হ্রাসের দাবিতে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্বতন সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার জন্যও এই সময়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

যে সব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা বিকশিত করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতন্ত্র, স্বায়ত্ত-শাসন ও প্রগতিশীল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয়ভার হ্রাসসহ জনগণের কল্যাণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও জনগণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন সংগ্রাম চালায়। ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্য ছাত্র সমাজের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে উঠতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন বিশেষত মুসলিম ছাত্র লীগের মধ্যে। ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে ছাত্র লীগ অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হয়।

এই সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার মনে হলেও সত্য যে, এক থেকে দেড় বছরের একটি সংগঠন—ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জয়লাভ করে। ছাত্র ইউনিয়ন নিছক নির্বাচনের জন্যই নির্বাচন করেনা—আন্দোলনের অংশ হিসেবেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তাই এই জয় আন্দোলনেরই জয় বলে বিবেচিত হয়েছিল।

এক সংগঠনের প্রয়াস ও দ্বিতীয় সম্মেলন

দলীয় মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে ছাত্র জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে একটি সংগঠন গড়ে উঠুক—এই ছিল ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষিত নীতি। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছাত্র লীগের সাথে আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয় যে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৪, ১৫ তারিখে উভয় সংগঠ-নের আলাদা আলাদা সম্মেলন হবে এবং ১৬ তারিখ উভয় সংগঠনের যুক্ত সম্মেলন হবে এক সংগঠন করার জন্য।

ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। শুধুমাত্র সামন্ত প্রভু ও শিল্পপতিদের সন্তানদের

জন্যেই শিক্ষা নয়—সকলের শিক্ষার সুযোগ প্রসার ও ব্যয় হ্রাসের দাবিতে সেখানে ছাত্র আন্দোলন বেশ অগ্রসর হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের ঐক্য আলোচনা চলার সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানভিত্তিক একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে করাচীর 'দাও মেডিক্যাল কলেজের' ছাত্র জনাব সারোয়ার ঢাকায় আসেন এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৪, ১৫ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটের একটি বাড়ির প্রাঙ্গনে। সম্মেলনে নতুন সভাপতি হন আবদুল মতিন এবং সাধারণ সম্পাদক হন গোলাম আরিফ টিপু। ঐক্যের প্রস্তাব ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলনে গৃহীত হয়। কিন্তু ছাত্র লীগ তখনই ঐক্যবদ্ধ হতে রাজী হয় না। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পর ঐক্যের কাজ শুরু করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশ ছাত্র লীগকে পরামর্শ দেয়। তখন ঠিক হয় যে নির্বাচনের পর মে মাসে যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দুই সংগঠন থেকে ৪ জন করে ৮ জন ও সারোয়ারকে নিয়ে গঠিত একটি আহ্বায়ক কমিটির উপর সম্মেলন আহ্বানের দায়িত্ব দেয়া হয়। অবশ্য পরবর্তীতে এ প্রক্রিয়া আর অগ্রসর হয়নি।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫০—৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয় ১৯৫৪ সালে। গণ-ধিকৃত মুসলিম লীগের রাজনীতিকে নির্বাচনে পরাভূত করে ভাষা আন্দোলনের ধারায় নতুন পথ রচনা করার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই ঐক্যের আওয়াজ উত্থাপন করে। পূর্ব বাংলার মূল দুই রাজনৈতিক দল সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীর আওয়ামী লীগ ও শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টিসহ মুসলিম লীগ বিরোধী অন্যান্য দলের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরমের দাবি অবশ্য সে সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিও উত্থাপন করে।

'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী এক হও' এই শ্লোগান উত্থাপন করে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে অগ্রসর হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী কৃষক প্রজা পার্টির নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রথমদিকে ঐক্যের ব্যাপারে অনীহা দেখান। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা তাঁকে ঘেরাও করে। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐক্যের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগও বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে ঐক্যের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম ও খেলাফাতে রব্বানী পার্টিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। স্বায়ত্তশাসন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা ইত্যাদি দাবি সম্বলিত ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

ছাত্র ইউনিয়নের ২য় সম্মেলনের পর থেকে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিশাল গণ জমায়েতের গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ৯টি আসন ছাড়া বাকি ২২৮ আসন লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। অমুসলিমদের আসন থেকে ৪টি আসন পায় কমিউনিস্ট পার্টি। শেরে বাংলা হন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে ২ মাসের মধ্যে ৯২ (ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যায়, কায়েম হয় গভর্নরের শাসন।

ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন

পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ বিরোধী গণ-জোয়ারে ভীত হয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করেই ক্ষান্ত হলো না—অত্যাচার নিপীড়নের নির্মম পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকল। ইসকান্দার মীর্জা গভর্নর হয়ে এসে সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ চালু করেন। শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন পরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। হক সাহেব হন গৃহবন্দী। সহস্রাধিক যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে ঢোকানো হয় জেলে। কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে যায় বেআইনী। গ্রেফতার করা হয় কমিউনিস্টদের। ছাত্র ইউনিয়নেরও

কেন্দ্র, জেলা, থানা পর্যায়ের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। সারা প্রদেশ জুড়ে চলে কেন্দ্রীয় শাসনের এক তাণ্ডবলীলা।

বজ্র আটুনীর সেই কঠিন দিনগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের অগ্রেপ্তারকৃত নেতা ও কর্মীরা গোপনে কাজকর্ম পরিচালনা করতে প্রয়াসী হন। সাংগঠনিক যোগাযোগ রক্ষা করে সংগঠনকে পরবর্তী করণীয়গুলো সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করতে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর মধ্যেই চলে আসে '৫৫ সালের একুশে। এই একুশকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে ছাত্র ইউনিয়ন। তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন বিশেষত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিশিষ্ট কর্মী জহির রায়হানের তত্ত্বাবধানে বিরাট প্রভাতফেরী বের হয়। সেই প্রভাতফেরীতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। প্রভাতফেরীতে পুলিশ হামলা করে ও ১৫০ জন ছাত্রীসহ বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যুক্তফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্ট করতে প্রয়াসী হয় পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ খাতিরের ভান করলেন আওয়ামী লীগের সাথে। অপর দিকে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী টোপ দিলেন হক সাহেবকে। ১৯৫৪ সালের ২০ ডিসেম্বর জনাব সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রের আইনমন্ত্রী হলেন। কেন্দ্রের কারসাজিতে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে যুক্তফ্রন্টের নামে কৃষক প্রজা পার্টির আবু হোসেন সরকার প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন '৫৫ সালের ৫ জুন। শেরে বাংলা হয়ে যান কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরবর্তীতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হন। ১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পতন হলে ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কেন্দ্রেও ইসকান্দার মীর্জার সহায়তায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছিল। এভাবেই যুক্তফ্রন্ট আর যুক্ত না থেকে ভঙ্গুর পথে পতিত হয়। এই ডামাডোলের মধ্যে ছাত্র লীগ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অন্ধ অনুসারী হয়ে থাকে। একমাত্র ছাত্র ইউনিয়নই আওয়াজ তোলে 'যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রক্ষা

করতে হবে'। এ প্রচেষ্টা তখন ফলপ্রসূ না হলেও ঐক্যের পতাকাধারী ছাত্র ইউনিয়নের সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠনের সময় সংখ্যা সাম্য-নীতি গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন সদস্য নেওয়ার নতুন ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবি উত্থাপন করে। অবশ্য পরবর্তীকালে উল্লিখিত দাবি এদেশের সব মানুষের দাবিতে পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানেও সংখ্যা-সাম্য নীতি বহাল থাকে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় বর্ণিত স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিরও কোন ফয়সালা হলো না। ছাত্র ইউনিয়ন এই অন্যায় ব্যবস্থা কখনো মেনে নেয়নি—সংগঠনের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী প্রতিবাদ প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। সাথে সাথে চলে শিক্ষা প্রসারের দাবিতে আন্দোলন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শিক্ষার আন্দোলন মোটামুটি জোরদার হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় সম্মেলন

১৯৫৬ সালে ছাত্র ইউনিয়নের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ অনুসৃত কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের নীতিসমূহ নিয়ে তখন স্বাভাবিক কারণেই জনমনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বিশেষত সংখ্যা-সাম্য নীতি, বিদেশনীতি, স্বায়ত্তশাসন, অর্থনীতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও তখন বিতর্ক চলছিল। ছাত্র লীগ অন্ধভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থনের কারণে উল্লিখিত প্রশ্নে কোন বক্তব্য উত্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। সঙ্গত কারণেই ছাত্র লীগের সাথে ছাত্র ইউনিয়নের ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অনুরূপ ব্যবধান আওয়ামী লীগ সরকারের সাথেও সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিতে ন্যায়ের সংগ্রামে অটল থাকার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের বরাবরের যে নীতি সে নীতিতে অর্থাৎ ঐক্যের নীতিতে অবিচল থাকার অঙ্গীকার নিয়েই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আবদুস সাত্তার সভাপতি ও এস, এ, বারী এ, টি, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

যুব উৎসব

১৯৫৭ সনের ৪—৭ জানুয়ারি রংপুর শহরে সারা দেশের ছাত্র যুবকদের নিয়ে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দেশে এই ধরনের উৎসব এই প্রথম। বামপন্থী যুব সংগঠন যুব লীগ এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা হলেও ছাত্র ইউনিয়ন এই উৎসবের কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন

কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী ও প্রদেশে আতাউর রহমান খানের সরকার অনুসৃত নীতিসমূহকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তার ফল হিসেবে আওয়ামী লীগ ভাগ হয়ে যায়। ১৯৫৭ সনের ৭—৮ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনেই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তিকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে সমগ্র আওয়ামী লীগ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী, পশ্চিম পাকিস্তানের গাফফার খান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী প্রমুখের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—(ন্যাপ) গঠিত হয় ২৫, ২৬ জুলাই। ইতিপুর্বে গঠিত গণতন্ত্রী দলও এই নতুন দলে এসে সামিল হয়।

সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারী করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ও মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। সংবিধান স্থগিত করে আইয়ুবকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত ইস্কান্দার মীর্জাও বিতাড়িত হন। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব হন সমগ্র ক্ষমতার অধীশ্বর।

সামরিক আইন জারীর পূর্বেই ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শাহ আজীজ আব্বাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ উদ্দিন। অবশ্য ঘটনার ক্রমপরিণতিতে এই কমিটি বিশেষ কোন কাজ করতে সক্ষম হয়নি।

রুদ্ধ দ্বারে সফল আঘাত

আইয়ুবের ক্ষমতা দখল হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছানুসারে। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি ইত্যাদি সহ পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে পাকাপোক্ত রূপ দেয়ার তাগিদে একটা পোক্ত সরকার দরকার— সেদিক থেকে মার্শাল ল-ই উৎকৃষ্ট পথ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদ নিয়ে আইয়ুব ক্ষমতায় এসেই সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত পোক্ত করতে তৎপর হন। তার জন্য রাজনীতি বন্ধ করা হলো। গ্রেপ্তার হলো শত সহস্র রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। ছাত্র সংগঠনগুলোর কাজও বেআইনী করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নও স্বাভাবিক-ভাবেই প্রকাশ্য কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

অন্য ছাত্র সংগঠন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেও ছাত্র ইউনিয়ন হাল ছেড়ে দিল না। কাজের ধরন একটু পরিবর্তন করে নিল মাত্র। অগ্রেপ্তার-কৃত কর্মীরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পথ ধরে অগ্রসর হলো। গোপনে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ দাঁড় করানো হলো। শাখা সমূহের সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা হয়। সাংস্কৃতিক কাজের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও গণতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৯৫৯ সালে একুশে উদযাপনের প্রস্তুতি নেয়া হয়, কিন্তু সামরিক সরকারের নগ্ন থাবার আগ্রাসনে তা সফল করা সম্ভব হয়নি।

ডাকসু নির্বাচন

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন দেওয়া হয় ১৯৫৯ সালে। কিন্তু ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকায় প্রকাশ্যভাবে

সংগঠনের নামে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের ফলাফল অবশ্য সরকারের অনুকূলে না গিয়ে ছাত্র ইউনিয়নসহ সরকারবিরোধীদের দিকেই যায়। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে।

সামরিক শাসন জারী হওয়ার পর প্রথম দিকে ছাত্র-জনতার মধ্যে আইয়ুব সম্পর্কে যে মোহের ভাব দেখা গিয়েছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানেই তা কাটতে শুরু করে। ডাকসু নির্বাচন তার প্রমাণ। মেডিক্যালসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নির্বাচন হয়। বিভিন্ন স্থানেই অনুরূপ সরকার বিরোধী চিত্র প্রতিফলিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্ব আস্থা সহকারে অগ্রসর হয়।

'৬০ সালের দিকে সংগঠনের বেশ প্রসার ঘটতে থাকে। নতুন নতুন কর্মী আসতে থাকে সংগঠনের কাজে। সামরিক শাসনের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সঙ্গত কারণেই সংগঠনের কাজে সাময়িক বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু '৬০ সালের দিকে এসে দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে।

এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আর সরকারী ভ্রূকুটি কার্যকরী হতে পারেনি। পাড়া-মহল্লা থেকেও প্রভাত ফেরী বের হয়। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ভালভাবে একুশে উদ্‌যাপিত হয়।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

আইয়ুব সরকার ক্ষমতায় এসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব ডঃ এস, এম, শরীফকে চেয়ারম্যান করে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, কমিশন ১৯৫৯ সালে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে অত্যন্ত নগ্নভাবে শিক্ষা সংকোচনের কথা বলা হয়। রিপোর্টে ধনীর সন্তানদের জন্য শিক্ষার দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা করে গরীবদের জন্য তা কার্যত বন্ধ করে দেয়া হয়। ডিগ্রী কোর্স ৩ বছরের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন কেটে দেয়া হয়। নতুন সিলেবাসে জাতীয় চেতনার বিকৃতি উদ্রেককারী বিষয়বস্তু পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়।

এই রিপোর্ট কার্যকরী করা শুরু হতেই ছাত্র বেতন বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে আরও সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

একুশ : ১৯৬১

এই বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ডাকসু ও বিভিন্ন হলে ক্ষমতাসীন ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ডাকসু ও হল সংসদের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি ঘোষণা, শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা, বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব এই সভায় গ্রহণ করা হয় এবং একুশে উদ্‌যাপনের বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলিত হয় ও ছাত্রছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। সকালে প্রভাত ফেরী বের হয়। তৎকালীন সরকারের হিসাব অনুযায়ী প্রভাত ফেরীতে শতাধিক ছাত্রী-সহ তিন হাজার জমায়েত ছিল। সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে শহীদ মিনারে প্রভাত ফেরী আসে ১০টায়। সেখানে শপথ গ্রহণের পর ঘোষণা পাঠ করেন ডাকসুর সহ-সভানেত্রী জাহানারা বেগম।

ঐদিন বাংলা একাডেমী, কার্জন হল ও বিভিন্ন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও ব্যাপক জমায়েত হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়ন, ডাকসু ও বিভিন্ন হলের পক্ষ থেকে সংকলনও প্রকাশ করা হয়েছিল। এভাবে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঐ বছর একুশে সামরিক শাসন বিরোধী গণমিছিলে পরিণত হয়েছিল।

আন্দোলনের প্রস্তুতি

সামরিক শাসন উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সরকারী শিক্ষানীতি বাতিলের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলতে থাকে ১৯৬০ এর

পর থেকে। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ছাত্র লীগের সাথে আলোচনা হয়। ছাত্র লীগ সংগঠনের তখন ঝিমানো অবস্থা। নির্বাচন হলে তারা যেন একটু তৎপর হয়, অন্য সময় চুপচাপ। আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারের লক্ষ্য নিয়েই ছাত্র লীগকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টাও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব গ্রহণ করে। গোপন যোগাযোগ দাঁড় করানো হয়—আন্দোলনে যাওয়ার আগে উভয় সংগঠন নিজ নিজ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দেয়।

ডাকসুর উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডাকসুতে তখন ছাত্র ইউনিয়ন ক্ষমাতাসীন। সহ-সভানেত্রী জাহানারা বেগম ও সাধারণ সম্পাদক অমূল্য চক্রবর্তী রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সমবেত হওয়ার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান। হাজার মানুষের ঢল নামে কার্জন হলে। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছায়া-নটের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সে দিন যে অনুষ্ঠান হয় তার কথা দর্শক শ্রোতারা অনেকদিন মনে রেখেছে। সরকার প্রথম থেকেই ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করতে চেয়েছিল। অনুষ্ঠান বন্ধ করতে অপারগ হলেও পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার করা হয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের। ডাকসু কার্যালয়ে গোয়েন্দাদের আনা-গোনা চলতে থাকে। মেয়েরা কেন লাল শাড়ী, লাল টিপ পড়েছিল—তাও ছিল এদের জিজ্ঞাসার বিষয়।

এই অনুষ্ঠানের ফলে জাতীয় চেতনা সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। শিক্ষা নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ, গণতন্ত্রের দাবিতে সংগ্রাম, জাতীয় চেতনা বিকাশ—ইত্যাদির ফলে একটা ধূমায়িত অবস্থার সৃষ্টি হয় ১৯৬১ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে। ছাত্রদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক দলসমূহের সক্রিয় তৎপরতা ছাড়া কোন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠতে বা সফল হতে পারে না—ছাত্র ইউনিয়ন এ সম্পর্কে সচেতন ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও এ সময়ে উদ্যোগ প্রচেষ্টা চলতে থাকে। গোপন কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে এ সময়ে আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়। ডিসেম্বরের শেষ দিকে ছাত্র ইউনিয়নও মূল সংগঠকদের সভা করে আসন্ন

আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করে। একুশে ফেব্রুয়ারি সামনে রেখেই আন্দোলন অগ্রসর করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

আইয়ুবের তখতে প্রথম ধাক্কা

একটা বেসামরিক আচ্ছাদন দিয়ে সামরিক শাসনকে পাকাপাকিভাবে চালু রাখার মানসে আইয়ুব খান একটি শাসনতন্ত্র দিতে প্রয়াসী হন ১৯৬১ সালে। তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে এই উদ্ভট শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইয়ুবের স্বেচ্ছাচার ছাত্র সমাজ মেনে নিতে পারে নি। ছাত্র ইউনিয়ন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবি উত্থাপন করা হয়। রাজনৈতিক দল সমূহের ঐক্য গড়ে তোলার জন্যও ছাত্র ইউনিয়ন যোগাযোগ করে। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হয় যে, সোহরাওয়ার্দী সাহেব সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্রের দাবিতে একটি বিবৃতি দেবেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ৩০ জানুয়ারি, ১৯৬২। এই গ্রেপ্তারের ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় জনমনে। ছাত্র সমাজও বিক্ষুব্ধ হয়। ৩১ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের বৈঠক হয়। যে আন্দোলন শুরু করার চিন্তা ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঘটনা চক্রে তা এগিয়ে এলো। ১ ফেব্রুয়ারিতেই সাধারণ ছাত্রদের নামে ডাকা হয় ছাত্র ধর্মঘট।

১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট চলে। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয় ঢাকার রাজপথ। ৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যলয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৬ তারিখ এর প্রতিবাদে বিরাট ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আমতলায়। সমাবেশ শেষে মিছিল কার্জন হল হয়ে সামনে অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ বাঁধা দেয়। শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। এক পর্যায়ে মিছিলের একটি বড় অংশ নাজিমুদ্দিন রোড হয়ে পুরানো ঢাকায় ঢুকে যায়। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত এ মিছিলে জনগণও যোগ দেয়। ফলে ঢাকায় কার্যতঃ হরতাল হয়ে যায়। ৭ ফেব্রুয়ারিও

বিশাল মিছিল বকশীবাজার হয়ে পুরানো ঢাকায় প্রবেশ করে। ছাত্রদের পরিচালিত আন্দোলন পরিণত হয় জনতার আন্দোলনে। ঐ দিন রাতে হলগুলো ঘেরাও করে পুলিশ-সেনাবাহিনী। জোর করে ছাত্রদের বের করে দেয়া হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের নামে জারী হয় হুলিয়া। কিন্তু আন্দোলনকে থামানো আর সম্ভব হয় না—আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে নগর থেকে শহরে—শহর থেকে গ্রামে—দেশের সর্বত্র।

মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর আবার আন্দোলন চাঙ্গা হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের বিধান সম্বলিত আইয়ুবী শাসনতন্ত্র প্রকাশ হওয়ার পর দেশের নয় জন বিশিষ্ট নেতা তা প্রত্যাখ্যান করে নতুন শাসনতন্ত্রর দাবিতে বিবৃতি দেন। জুন মাসের ২৪ তারিখে ৯ নেতার যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ হলে ছাত্র জনতার মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দল পুনরুজ্জীবিত না করে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে বিশাল বিশাল জনসভা হয়। আগস্ট মাসে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আইয়ুব প্রদত্ত শিক্ষা নীতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৭ সেপ্টেম্বর আহ্বান করা হয় হরতাল। সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হন মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ। ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখ পালিত হয় শোক দিবস। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। এভাবে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় সংগ্রাম। আইয়ুব বাধ্য হয় মাথা নত করতে। শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন আংশিক স্থগিত ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক অধিকার হয় স্বীকৃত। এই আন্দোলন পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত চলেছিল। গ্রেপ্তার-নির্যাতন অগ্রাহ্য করেই অগ্রসর হয়েছিলেন তৎকালীন ছাত্র নেতৃত্ব। বলা বাহুল্য, এই অন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠন।

কনভেনশন ঃ নতুন কমিটি

১৯৬২ সালের ২০ ও ২১ অক্টোবর ঢাকার স্বামীবাগ রোজগার্ডেনে দীর্ঘদিন পর ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা একটি কনভেনশনে মিলিত হন। আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে ছাত্রদের সাথে নতুন নতুন যোগাযোগ স্থাপিত

হয় সারা দেশে। ঢাকায়ও কেন্দ্রীয় কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন অথচ সম্ভাবনাময় মুখ। কনভেনশন তাই নতুন সম্ভাবনার আলোকে উজ্জ্বল। কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিতে হবে—স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই মূল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে আহমেদ জামান সভাপতি ও কাজী জাফর আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে জয়নাল আবেদীন কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

নতুন কমিটির উদ্যোগে সারা দেশে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। আন্দোলনের সময় যে সব নতুন নতুন যোগসূত্র রচিত হয়েছে সেগুলির সাথে সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাজ, অন্যদিকে সংগঠনের কাজ। হুলিয়া, নির্যাতন ইত্যাদি মাথা পেতে নিয়েই ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব কাজে অগ্রসর হন এবং শীঘ্রই একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হন, যার উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলন : ১৯৬৩

আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৬৩ সালের ১৭, ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রেলওয়ে মিলনায়তনে। সম্মেলনের প্রথম দিন একটি সুসজ্জিত র‌্যালী ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে শহরবাসীকে তাক লাগিয়ে দেয়। শেষ দিনে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দ্বারা দর্শক শ্রোতার হৃদয়ে ছাত্র ইউনিয়নের নাম স্থায়ী আসন গাড়তে সক্ষম হয়। নতুন পটভূমিতে সংগঠনের খসড়া ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হয়। প্রায় সব জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন বদরুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক হন হায়দার

আকবর খান রনো। পরবর্তী সময়ে বদরুল হক গ্রেপ্তার হয়ে গেলে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন পংকজ ভট্টাচার্য। এক সময়ে নূরুর রহমান কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হন। ছাত্র ইউনিয়নকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে মজবুত করার শ্লোগান নিয়ে প্রতিনিধিরা সম্মেলন উত্তরকালে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সম্মেলনের বছর ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত মেনন-মতিয়া পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হয়। জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন হলেও ছাত্র ইউনিয়ন জয়ী হতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন কলেজ নির্বাচনেও ছাত্র ইউনিয়ন জয়ী হয়। সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন অনেকটা একক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিক গণ-সংগঠনের রূপ লাভ করে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে খুলনায় ও কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এর জের হিসেবে ঢাকায় দাঙ্গা সৃষ্টির উপক্রম হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা এর মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সরকারী ছাত্র সংগঠন এন. এস. এফ. সরকারী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মানসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সভা করে। ছাত্র লীগ নেতাও এতে বক্তৃতা করেন। সভা শেষে মিছিল করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন ঠিক করে 'জীবন দিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল বের করা বাধা দেবে।' কারণ এ ধরনের মিছিল থেকে দাঙ্গা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্ষরে অক্ষরে সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে। ডাকসু কার্যালয় তছনছ হয়, নেতাদের মাথা ফাটে, তবুও মিছিল বের হতে পারে না।

দাঙ্গার সম্ভাবনা আছে এমন এলাকায় পালা করে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পাহারা দেয়। খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট প্রভৃতি স্থানেও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে ও দাঙ্গা বিধ্বস্তদের সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ঢাকায় জগন্নাথ হল ও জগন্নাথ

কলেজের দু'টি ত্রাণকেন্দ্র ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পরিচালনা করে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর আর একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়। 'অবাঙ্গালীরা দাঙ্গা করেছে'—এই অজুহাতে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। ছাত্র ইউনিয়ন এই অপপ্রয়াসও প্রতিহত করে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন প্রকৃত মানব হিতৈষী সংগঠন হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের আন্দোলন

দাঙ্গা সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের আন্দোলন বন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু তা তারা করতে পারল না। খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠতে থাকে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে (১৯৬৪) ছাত্র ইউনিয়ন থেকে এটাই ছিল মূল শ্লোগান। ছাত্র লীগ ও ছাত্রশক্তির সাথেও এই বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এই প্রশ্নে তাদের সাথে ছাত্র ইউনিয়নের সমঝোতা হয়। তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা অব্যাহত থাকে।

১৯ মার্চ দেশব্যাপী ভোটাধিকার দিবস পালিত হয়। দেশের সর্বত্র সর্বাত্মক হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দাঙ্গার ক্ষত মুছে গিয়ে আন্দোলনের কাফেলা এগুতে থাকে।

সমাবর্তন উৎসব

পূর্ব পাকিস্তানের ঘৃণিত গভর্নর মোনায়েম খাঁ চ্যান্সেলার হিসেবে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে আসার পাঁয়তারা করলে ছাত্র সমাজ প্রতিরোধ করে। রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ও ঘৃণিত এই ব্যক্তিটির বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ যে কোন মূল্যে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা শহরের কর্মীসভায়। 'বিতর্কের উর্ধ্বে একজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ কিংবা হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতি এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন'—এই ছিল ছাত্র ইউনিয়নের দাবি। এই

দাবিই ছাত্র সমাজের দাবিতে পরিণত হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব থেকে ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে মোনায়েম খাঁ পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ মার্চ (১৯৬৪) ছিল উৎসব অনুষ্ঠানের দিন। এর আগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং গুণ্ডাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তবুও ছাত্ররা বীর বিক্রমে প্রতিরোধ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবে পৌরহিত্য করার মোনায়েম খাঁর খায়েশের এভাবেই ইতি ঘটে।

এই ঘটনার জের ধরে ছাত্র সমাজের উপর বর্বর হামলা শুরু হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী গ্রেফতার হন। অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। রাস্তাঘাটে ছাত্রদের উপর পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর মারপিট চলতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জনের ডিগ্রী কেড়ে নেয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতিসহ ২২ জনকে রাসটিকেট করা হয় ও ২৪ জনের উপর ১ বছরের জন্য মুচলেকা সইয়ের আদেশ জারী করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয় ও রাকসু বাতিল করে দেয়া হয়। ঢাকা কলেজ থেকে ১০ জন ও আর্ট কলেজ থেকে ৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

মোনায়েম শাহী ও এন. এস. এফের রাজত্বের সেই কালো অধ্যায়ের দিনগুলোতে ছাত্র ইউনিয়ন সব হামলা-নির্যাতনের মুখেও বিপ্লবী সৈনিকের ভূমিকা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে গিয়েছে। ছাত্রদের ডিগ্রী বাতিল ও বহিষ্কারের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রীট করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা জাকির আহমদ এ রীট আবেদন করেন। হাইকোর্ট ছাত্রদের পক্ষে রায় দেয়।

২২ দফা দাবি

ছাত্র আন্দোলনের 'মুল সনদ' প্রস্তুত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সনদ প্রস্তুত করে সমগ্র পুর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি

কনভেশন আহ্বান করে ছাত্র আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা ছিল ছাত্র ইউনিয়নের। ছাত্র লীগ ও ছাত্র শক্তির সাথে আলোচনা চলে মাসাধিককাল। রচিত হয় ২২ দফা কর্মসূচী। শিক্ষা বিষয়ক দাবি, ছাত্র নির্যাতন বন্ধ ইত্যাদি দাবি এর মধ্যে স্থান পায়। 'মূল সনদ' রচিত হলেও কনভেনশন করতে অপর দুই সংগঠন রাজী হয়না। তখন বাধ্য হয়ে ৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা নগরের কর্মীদের এক সমাবেশে তা উপস্থাপন করে পাশ করানো হয়।

২২ দফার ভিত্তিতে সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ ১৭ সেপ্টেম্বর পালন। সরকারী গুণ্ডামী ছাত্রদের স্তব্ধ করে দিতে চায়। ফলে কয়েকবার পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেলো। শহরবাসীও এসে যোগ দেয় ছাত্রদের সাথে। ছাত্রবন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ২৯ সেপ্টেম্বর পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস। ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্য দু' সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করা হয় ২৯ সেপ্টেম্বর হরতাল আহ্বানের জন্য। পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল।

ডাকসু সাধারণ সম্পাদিকা মতিয়া চৌধুরীর গ্রেপ্তার ও ছাত্রী মিছিলে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রীসহ ব্যাপক সংখ্যক মহিলা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে গভর্ণর হাউসের সামনে বিক্ষোভ করেন। এই বিক্ষোভ সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন।

ঐ সময়ে তিন ছাত্র সংগঠনের ঐক্য বেশ সক্রিয় ছিল। ১৯৬৫ সালে বিভিন্ন নির্বাচনে এন. এস. এফের বিরুদ্ধে যৌথ প্যানেল দেয়া হয় এবং তা জয়যুক্ত হয়। এককভাবে ছাত্র ইউনিয়ন অনেক স্থানে জিততে পারলেও বাস্তবতার প্রয়োজনে তখন নির্বাচনী ঐক্যের পথ ধরেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অগ্রসর হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

২ জানুয়ারি, (১৯৬৫) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ছিল ভোটার। নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী

হিসেবে মিস্ ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনীত করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভা করে ঠিক করা হয় 'দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের পক্ষ সমর্থন করা এবং মিস্ জিন্নাহর জয়ের জন্য চেষ্টা করা।' গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন সমূহকে এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ ছাত্র ইউনিয়ন গ্রহণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ ও ছাত্র শক্তির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে আইয়ুবকে পরাজিত করে গণতন্ত্রের প্রতীক ফাতেমা জিন্নাহকে জয়যুক্ত করার জন্য নির্বাচনী কলেজ ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে 'গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র' এবং 'স্বাধীনতা ও মুক্তি বনাম গোলামী ও জুলুমবাজী' এর সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করে 'ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে' দেশবাসী ও নির্বাচনী কলেজকে 'অকুতোভয়ে সামিল' হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্যও সেদিন কর্মসূচী উপস্থাপন করা হয়। কর্মসূচীটি নিম্নরূপ :

* সকল ইউনিয়ন এবং সম্ভব হইলে সকল ইউনিটে "ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী" কমিটি গঠন। রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ছাত্র, যুবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে ইহা গঠন করা।
* সকল ইউনিটে কিংবা অঞ্চল ভিত্তিতে জনসভা করিয়া নির্বাচনী কলেজের প্রতিটি সদস্যের উপর মিস্ জিন্নাহর সমর্থনে ম্যাণ্ডেট প্রদান ও শপথ গ্রহণ।
* শহরে-গ্রামে সর্বত্র প্রচার, জনসভা, পথসভা, ছোট এবং বড় মিছিল অনুষ্ঠান।
* ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের উপস্থিত করা ও ক্ষমতাসীনদের কবজা হইতে তাহাদের রক্ষা করা।
* ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রের নিষিদ্ধ সীমার বাহিরে হাজার হাজার গণ জমায়েতের ব্যবস্থা।
* শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য সর্বসময়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা।
* মিস্ জিন্নাহর নির্বাচনী তহবিলে অর্থ প্রদান ও অর্থ সংগ্রহ।

নির্বাচনের এ কাজকে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে পরিচালনা করে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে এই নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা সারাদেশে নিজ নিজ দায়িত্বে সাধ্যাতীত কাজ করে যায়। নির্বাচনী কাজ করতে গিয়ে দিনাজপুরের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী মোজাম্মেল আইয়ুব বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। নির্বাচনী কাজে কেন্দ্র থেকে ১৭০ জন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বিভিন্ন জেলায় যায় এবং চার শতাধিক কর্মী নিজ নিজ গ্রামে কাজ করতে যায়।

সাংস্কৃতিক কাজ

ছাত্র ইউনিয়ন বরাবরই সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা এগিয়ে নিতে প্রয়াসী। ১৯৬৩-৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম বিভিন্ন জেলা সফর করে এবং অনেক সফল অনুষ্ঠান করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনের পর শহীদ দিবসে শহীদ মিনারে গণসঙ্গীতের আসর বসানো হয়। ছাত্র ইউনিয়নের এ অনুষ্ঠান দেখে হাজার হাজার মানুষ নিকট অতীতের গ্লানি দূরীভূত করে আশায় বুক বাঁধতে সক্ষম হন। ১৯৬৪ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি 'প্রতিধ্বনি' ও পরের বছর 'বিক্ষোভ' নামে সংকলন বের হয়। ১৯৬৪র সেপ্টেম্বরে 'সূর্যজ্বালা' সংকলন পুলিশ প্রেস থেকে নিয়ে যায়। এই সময়ে যেসব সংকলন প্রকাশ হয় সেগুলো আসলেই প্রশংসার দাবিদার। সংগ্রামের শপথ আর জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিধ্বনিতে মুখর ছিল ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

মাওবাদীরা সংগঠন ত্যাগ করে ঃ ১৯৬৫

এপ্রিলের ১, ২, ৩ তারিখে সম্মেলন হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। সম্মেলনের অনেক আগে থাকতেই সংগঠনের একাংশের মধ্যে মাওবাদের প্রভাব সৃষ্টি হয়। মাওবাদের গরম কথায় আকৃষ্ট হয়ে এরা সংগঠনের মধ্যে কতকগুলো বিভ্রান্তি নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। আইয়ুব সরকার সম্পর্কেও মোহগ্রস্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে এরা।

সম্মেলনের সময় এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সম্মেলন পণ্ড করে দিতে সচেষ্ট হয়। এসব সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব গঠনতান্ত্রিক রীতি মোতাবেক সম্মেলন সমাপ্ত করতে উদ্যোগী হন। কার্যকরী সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়:

'…রাজনৈতিক মত, চিন্তাধারা, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন প্রশ্নে মত দেওয়া একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনেরই বৈশিষ্ট্য। ইহা সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। আমাদের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে একটি মতে পৌঁছতে হবে এবং সংগঠনের গৃহীত সিদ্ধান্তকে সকলে কার্যকরী করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে করতে হবে… ।'

কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ধারকাছ দিয়েও দলছুটরা গেল না, সম্মেলনে হামলা করে তারা সম্মেলনকে পণ্ড করে দিতে সচেষ্ট হয়। এই অবস্থায় সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করে ইকবাল হলে নিয়ে আসা হয়। শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। মতিয়া চৌধুরীকে সভাপতি ও সাইফউদ্দিন আহ্‌মেদ মানিককে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলন উত্তরকালে সঙ্গত কারণেই নতুন নেতৃত্বকে অধিকতর গুরুত্ব-সহকারে সংগঠন গুছানোর কাজে অগ্রসর হতে হয়। দলছুটদের বিভ্রান্তি-কর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে সঠিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগঠনের নেতৃত্ব নিরলস প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। সংগঠনেয় সকল পর্যায়ে ব্যাপক রাজনৈতিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকাসহ সারাদেশে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চষে বেড়াতে থাকেন। অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয় অধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এর ফলে একদিকে মাওবাদীদের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়, অন্যদিকে কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মানও বৃদ্ধি পায়। নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় খুব স্বল্প সময়ে সংগঠন গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। 'যুদ্ধ দ্বারা নয়, শান্তিপুর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়ার জন্য' ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। এই সময়ে এন, এস, এফ ও মাওবাদীদের পক্ষ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের অনেক কর্মীর উপর 'ভারতের দালাল'' বলে হামলা চালানো হয়। তবুও ছাত্র ইউনিয়ন সঠিক বক্তব্যে অটল থাকে। মাওবাদীরা এই যুদ্ধে আইয়ুবকে সমর্থন করেছিল।

ছয় দফা

যুদ্ধোত্তর পাকিস্তানে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে শেখ মুজিবর রহমান ছয় দফা কর্মসুচী ঘোষণা করেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, দেশরক্ষা বাণিজ্য-পররাষ্ট্র বিষয়ের উপর প্রদেশের আংশিক নিয়ন্ত্রণ সম্বলিত এই ছয় দফায় বাঙ্গালীর জাতীয় স্বার্থের কথা প্রতিফলিত হয়। আওয়ামী লীগ-ছাত্র লীগ থেকে বলা হয়, ছয় দফা হচ্ছে 'মুক্তি সনদ'। অন্যদিকে মাওবাদীরা বলে এটা 'সি, আই, এর' দলিল। ছাত্র ইউনিয়ন এর কোনটিকেই সঠিক বলে মনে করেনি। ছয় দফা ন্যায্য, তবে অসম্পুর্ণ। এই দাবিসহ পুর্ণাঙ্গ কর্মসুচীর ভিত্তিতে আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন আহ্বান জানায়। ৬ দফা দাবিতে ১৯৬৬ সনের ৭ জুনের হরতালে শ্রমিক মনু মিয়াসহ অনেকে শহীদ হন। ছাত্র ইউনিয়ন এই হরতাল সমর্থন করে। সেদিন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী গ্রেফতার-নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

দশম সম্মেলন

১৯৬৬ সালের শেষ দিকে ৪ দিনব্যাপী দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে। সংগঠন থেকে মাওবাদীদের বের হয়ে যাওয়ার

পর প্রথম এই সম্মেলনে নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে বিস্তারিত আলোচনার পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সঠিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। পূর্বেকার সম্মেলনে সংগঠনের ঐক্য নষ্ট হওয়ায় আন্দোলনের যে ক্ষতি হয় তা কাটিয়ে উঠে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার বক্তব্য নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রখ্যাত সাতারু শ্রী ব্রজেন দাস। সম্মেলনের প্রথম দিন বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয় গণসঙ্গীতের আসর। শেষ দিনে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্র নাথের নাটক তাসেরদেশ। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতি হন সাইফ উদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সামসুদ্দোহা।

সংকট কাটিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠন আবার শক্তিশালী সংগঠনের রূপ লাভ করার লক্ষণ এই সম্মেলনে পরিলক্ষিত হয়। সম্মেলন উত্তর-কালে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত মাহফুজা-মোর্শেদ পরিষদ জয়লাভ করে। দেশের অনেক কলেজেও ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করতে থাকে।

পাকিস্তানী শাসক-গোষ্ঠীর বাঙালী সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিরোধী বক্তব্য প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন ছাত্র ইউনিয়ন তাতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ পালন, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের উপর অনুষ্ঠান, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছাত্র ইউনিয়ন।

আন্দোলনের প্রস্তুতি

আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন দশম সম্মেলন উত্তরকালে

আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবকের নিজস্ব দাবি, জাতীয়করণ, জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ইত্যাদি বক্তব্যের ভিত্তিতে ছাত্র জনতার মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ব্যাপক প্রচারকাজ পরিচালনা করে। সভা-সমাবেশ, প্রচারপত্র-পোষ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরার ফলে ছাত্রজনতার মধ্যে আন্দোলনের পক্ষে মনোভাব চাঙ্গা হয়ে উঠে।

আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র লীগের সাথে আলোচনা চলতে থাকে। '৬৭ সালে ডাকসু নির্বাচনে প্রোগ্রাম ভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মেনন গ্রুপের মধ্যে আন্দোলনের প্রশ্নে নবতর উপলব্ধি আসে। এমনকি সরকার সমর্থক এন, এস, এফ-এর একটা অংশের মধ্যেও কতক বিষয়ে সরকার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্দোলনের প্রশ্নে সমঝোতা গড়ে উঠতে থাকে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ মিলে সংযুক্ত বিরোধী দল গঠন করেন। অন্যান্য দলের সাথেও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রশ্নে আলোচনা চলতে থাকে। আসন্ন মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার বিষয়টিও সামনে আসে।

সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ নভেম্বর (১৯৬৮) ছাত্র সংগঠনগুলোর আহ্বানে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও ভূট্টোর মুক্তির দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। রিক্সাচালক হত্যার প্রতিবাদে ডিসেম্বরে (৭.৮) ঢাকায় হরতাল হয়। ১৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের উদ্যোগে প্রদেশব্যাপী পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস।

এই আন্দোলনমুখী পরিস্থিতিতে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়ন করে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ছাত্রলীগ, মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন, মাহবুবুল হক দোলন ও নাজিম কামরান পরিচালিত এন, এস, এফ-এর সাথে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মসূচী ভিত্তিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। জানুয়ারী (১৯৬৯) বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন থেকে আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

১১ দফা

১ জানুয়ারী প্রতিবাদ দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ৬ দফার সাথে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, জাতীয়করণ ইত্যাদি দাবি যুক্ত করে রচিত হয় ১১ দফা কর্মসূচী। ৪টি সংগঠন মিলে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি ৮টি রাজনৈতিক দল গঠন করেন ডেমোক্রেটিক অ্যাকশান কমিটি (ডাক)। শুরু হয় ছাত্র সমাজের ১১ দফা ও ডাকের ৮ দফার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক লড়াই।

গণ অভ্যুত্থান

১৭ জানুয়ারী দাবি দিবসে ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। সংগ্রামের কাফেলা অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলে ১৮, ১৯, ২০ তারিখ পর্যন্ত। ছাত্র জনতার পদভারে প্রকম্পিত হয় ঢাকা নগরী। ২০ তারিখ মেডিক্যালের সামনে শহীদ হন ছাত্র নেতা আসাদ। ২১ তারিখ হয় হরতাল। ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখ পালিত হয় শোকের কর্মসূচী। ২৪ জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন সর্বস্তরের মানুষ নামে রাজপথে। নিহত হয় স্কুল ছাত্র মতিউরসহ অনেকে। জনতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপ লাভ করে গণ অভ্যুত্থানের। কারফিউ উপেক্ষা করে লক্ষ মানুষের ঢল নামে রাজপথে। সরকার কার্যতঃ অচল হয়ে যায়।

আন্দোলনকে সঠিকখাতে প্রবাহিত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন সে সময় কতকগুলো বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয়। আন্দোলনকে পরিকল্পিতভাবে নিচের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং একটা যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের প্রস্তাব মতো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৯ দফা নির্দেশাবলী প্রচার করে। নির্দেশাবলী ছিল নিম্ন রূপ :

১. প্রদেশের সকল জেলায়, মহকুমায়, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মহল্লা এবং শ্রমিক অঞ্চলে সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের উদ্যোগে

সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন। এই সকল কমিটি হইতে আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিতভাবে পরিচালনা করুন। স্থানীয় কমিটিগুলি উপরের কমিটির সাথে যোগাযোগ করুন।

২. আন্দোলনের কর্মপন্থা ঘোষণার জন্য এই সকল কমিটি হইতে প্রচার পত্র, প্রাচীর পত্র, পথসভা, মাইক ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করুন।

৩. সকল জনগণকে সংগঠিত করুন।

৪. গ্রাম অঞ্চলে গণ অভ্যুত্থানকে ছড়াইয়া দিন।

৫. সর্বত্র হাজার হাজার সুশৃঙ্খল সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করুন।

৬. সংগ্রামকে সফল করার জন্য ছাত্র শ্রমিক সেচ্ছাসেবক হিসাবে আগাইয়া আসুন।

৭. সকল সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। সকল প্রকার সরকারী উস্কানীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

৮. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন।

৯. সকল সময় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী বিনা প্রশ্নে মানিয়া চলুন।

ছাত্র সমাজের প্রতি এই নির্দেশ প্রদান ছাড়াও দেশবাসীর উদ্দেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে চারদফা আবেদন জানানো হয়।

১. গুলীবর্ষণ, বেয়নেট চার্জ ও লাঠির আঘাতে আহতদের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রক্ত দান করুন। সান্ধ্য আইনের বিরতির কালে সম্ভবমত রক্ত দান করুন। নিহত ও আহতদের পরিজনকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন।

২. রিক্সাচালক, ক্ষুদে মজুর, এবং দরিদ্র জনসাধারণকে বেশী করিয়া ভাড়া ও মজুরী দিন ও যথাসাধ্য সাহায্য করুন। রিক্সা মালিকদের নিকট আমাদের আবেদন, তারা যেন পুরো দিনের ভাড়া গ্রহণ না করেন।

৩. দোকানদার ও ব্যবসায়ী ভাইয়েরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ না করিয়া ন্যায্য মূল্য গ্রহণ করুন।

৪. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে অগ্রসর করুন। যে কোন প্রকার সরকারী উস্কানীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

এদিকে সরকার ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে কারফিউ জারী করে ও সেনাবাহিনী তলব করে। হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু আন্দোলন না থেমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৬ ফেব্রুয়ারী 'কালো দিবসে' ঢাকা, লাহোরসহ গোটা পাকিস্তান পরিণত হয় কালো পতাকার দেশে। ৯ ফেব্রুয়ারী বন্দী নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করার জন্য লক্ষ মানুষ ঘেরাও করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। পরে অবশ্য জনতা নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ফিরে আসে।

সরকার বাধ্য হয় মাথা নত করতে। দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য আইয়ুব খাঁ গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। আন্দোলনের চাপে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কিছু দাবি মানতেও বাধ্য হয়। ২১ ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, মণি সিংহসহ রাজবন্দীরা মুক্তি পান।

২৬ ফেব্রুয়ারী ও ১০ থেকে ১৩ মার্চ দুই দফায় গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ ৬ দফা ও ১১ দফার মূল মূল বিষয়ে কোন ফয়সালা হলোনা। তাই কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়। ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের মুখে আইয়ুব স্বৈরাচারের আর কিছুই করার থাকল না, ২৬ মার্চ (১৯৬৯) আইয়ুব পদত্যাগ করেন। দেশে জারী হয় আবার সামরিক আইন। এবারের নায়ক ইয়াহিয়া খান।

স্বাধীনতার বীর সেনানী

৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান এদেশে সামরিক একনায়কদের শাসন অচল করে বেসামরিক গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা অবধারিত করে তুলে। শাসককূল সহ কারোরই এই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। ক্ষমতাসীন হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

একাদশ সম্মেলন

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে সামরিক আইনের মধ্যেই ছাত্র ইউনিয়নের একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের এই সম্মেলন হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে। এ বছরের প্রথম দিকে এই সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের জন্য তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। আন্দোলনের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের শপথ উচ্চারিত হয়। সম্মেলনে সামসুদ্দোহা সভাপতি ও নুরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ত্রাণ কাজ

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডেমরা অঞ্চলে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড়ে এলাকায় বিধ্বস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠিত শক্তি নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সাধ্যমত সাহায্য সংগ্রহ করে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ সরবরাহ করার পাশাপাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করার কাজেও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা আত্মনিয়োগ

করে। ছাত্র ইউনিয়ন এতো নিষ্ঠার সাথে এ কাজ সম্পাদন করে যে, সরকারী ও অন্যান্য ত্রাণদলগুলিও তাদের উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করতে থাকে। কয়েকমাস ধরে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে ঐ এলাকায় ত্রাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ এলাকার শ্রমজীবী মানুষের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে অনেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতাই সে এলাকায় শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনীতি করতে এগিয়ে যান। ৭০ সালে বাওয়ানীতে সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

শিক্ষানীতি নিয়ে সংগ্রাম

ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতাসীন হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যেই একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ এর জুলাই মাসে। আইয়ুব খান সরকার প্রদত্ত শিক্ষানীতির সাথে এই নতুন প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা, উচ্চ শিক্ষা সংকোচন, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা—ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলিত হয় নতুন শিক্ষানীতিতে। সঙ্গত কারণেই ছাত্র ইউনিয়ন এই নতুন শিক্ষানীতি মেনে নেয়নি। এই শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করে ছাত্র ইউনিয়ন ১১ দফায় বর্ণিত শিক্ষা বিষয়ক দাবির ভিত্তিতে বিজ্ঞানভিত্তিক-গণমুখী-গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির দাবি উপস্থিত করে।

এ ছাড়া ছাত্রলীগ এবং মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের সাথে মিলিতভাবেও ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য স্থির করে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে ছাত্র সমাজের এই বক্তব্য সরকারের নিকটও পেশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানীতি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট ডাকসুর উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি সামসুদ্দোহার বক্তব্য প্রদানকালে সরকারী শিক্ষানীতির সমর্থক

ইসলামী ছাত্র সংঘ হামলা চালায়। ছাত্র সমাজ এই হামলা বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে।

পরবর্তীতে সরকার 'পাকিস্তান—দেশ ও কৃষ্টি' নামে বিকৃত ইতিহাসের স্কুল পাঠ্য বই নবম ও দশম শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করে। এই বই বাতিলের দাবিতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৭০ সালে। এই আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলার স্কুলসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত হয় স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

সাধারণ নির্বাচন

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল করেন এবং ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি চালু ও 'এক লোক এক ভোট' এই নীতির ভিত্তিতে ৫ অক্টোবর পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন।

ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের অব্যবহিত পরেই ছাত্র ইউনিয়ন ভাষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যে কোন মুল্যে ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য দেশবাসী ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানানো হয়। ইয়াহিয়া প্রদত্ত ঘোষণাকে জনগণের বিজয় বলে চিহ্নিত করে সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি, হুলিয়া-মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার পদক্ষেপও ছাত্র ইউনিয়ন গ্রহণ করে।

পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার, নির্বাচনের সাথে সাথেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা প্রদান করা হয় ও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচারপত্র বের করা হয়।

১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ (L. F. O) ঘোষণা করা হয়। 'এক লোক এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে ৩০০ জাতীয় পরিষদ

সদস্যের মধ্যে ১৬২ জন হবে পূর্ব পাকিস্তানের এবং প্রথম অধিবেশন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করা গেলে জাতীয় পরিষদ বহাল থাকবে বলে এই ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। এল, এফ, ও, ঘোষণার পর ১৩ এপ্রিল (১৯৭০) ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবিতে এবং ইয়াহিয়ার আইনগত কাঠামো আদেশ ও শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণার প্রতিবাদে আহুত এই দিবসে বটতলায় বিশাল ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্র ইউনিয়ন তার বক্তব্য দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করে। কোন দল কিংবা প্রার্থীর পক্ষে নয়, বরং সাধারণভাবে এগার দফার পক্ষের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন দেশবাসীর প্রতি আহবান জানায়। নিজস্ব বক্তব্য ব্যাখ্যা করার জন্য জমায়েতের কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। ১১ দফার প্রার্থীদের জয়যুক্ত করানোর জন্য ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনকে ৬ দফার গণভোট হিসেবে ঘোষণা করে। সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ব বাংলার জনগণ বাঙালী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ দফার পক্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে সৃষ্ট অবস্থার ফলে ৭ ডিসেম্বর (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তানের ২টি ছাড়া সব কটি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের অধিকার লাভ করে।

দ্বাদশ সম্মেলন

১৯৭০ সালের ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ছাত্র ইউনিয়নের দ্বাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসীন হল মাঠের মতো খোলা স্থানে এতবড় ছাত্র সম্মেলন ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। বিরাট ও জাঁকজমকপূর্ণ এই সম্মেলন ছাত্র ইউনিয়নের অতীত সংগ্রামে অবদানের স্বীকৃতিই বহণ করে। নুরুল ইসলাম সভাপতি ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজ ও দেশবাসী যে

আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা শপথ গ্রহণ করেন। সে জন্য প্রকৃত জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাভূত করে ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।

জলোচ্ছ্বাস

১৯৭০ সালের ১১ নভেম্বর স্মরণাতীত কালের সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছে যায়। লাখ লাখ দুর্গত মানুষের পাশে শত শত ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যায়। এই কাজে ছাত্র ইউনিয়ন সংস্কৃতিসেবী সহ বিভিন্ন স্তরের লোকদের সংগঠিত করে কাজে নামে। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সেবামূলক কাজের জন্য বাংলাদেশের দুর্গত এলাকার মানুষের মনে ছাত্র ইউনিয়ন ভালোবাসার আসনে স্থান লাভ করে।

ডাকসু নির্বাচন ঃ ১৯৭০

'৭০ সালে ডাকসু নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগের পক্ষে বিরাট জনসর্থনের পরিস্থিতিতে। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্র সমাজও তখন সে স্রোতধারায় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর মধ্যেও নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন অল্প ব্যবধানে হারে ডাকসুতে। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ইকবাল আহমেদ সহ কয়েকজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ডাকসুতে জয়ী হয়। রোকেয়া হল ও জগন্নাথ হলে অবশ্য ছাত্র ইউনিয়ন বিপুল ভোটে জয়ী হয়। গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা ও ক্রীড়া-সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপই ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয়তাবাদের এই জোয়ারের মধ্যেও নিজ অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল ধারা এই ভাবে স্বাধীনতার আগে থেকেই ডাকসুর অবস্থান গ্রহণ নির্ধারণে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, এটাই ছিল ডাকসুতে প্রথম ছাত্রদের ভোটে সরাসরি নির্বাচন। এর আগে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল।

ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান কালক্ষেপনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন না ডেকে তালবাহানা করে সময় কাটানো হতে থাকে। ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারী (১৯৭১) ইয়াহিয়ার ঢাকা অবস্থান কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ কালে তাঁকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর পিণ্ডীতেও বৈঠক হয়। ইয়াহিয়া ভুট্টো, মুজিব-ভুট্টো বৈঠক হয়। অনেক তালবাহানার পর ইয়াহিয়া খান ১১ ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় বসবে। পরবর্তী পর্যায়ে ভুট্টো অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এটা তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে জনগণের ভোটের রায় বানচালের চক্রান্ত চলছে।

জরুরী কাউন্সিল

জনগণের রায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের চক্রান্ত সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই সজাগ ছিল। এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল জনতার প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য থেকে ছাত্র ইউনিয়ন ১৪ ফেব্রুয়ারী মধুর কেন্টিনে বিশেষ জরুরী কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করে। কাউন্সিল অধিবেশন থেকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিষয়ে ১৪ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-তন্ত্রের রূপরেখা বর্ণনা করতে গিয়ে কেন্দ্রে পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার, প্রতি ৪ বছর পর পর সাধারণ নির্বাচন, নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সম অধিকার, বাক্-ব্যক্তি-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সহ মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার যার হাতে মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতিত পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষার ভার থাকবে এবং অন্যান্য বিষয় সহ প্রদেশে স্বায়ত্তশাসিত সরকার, বিভিন্ন জাতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার প্রদান, ব্যাংক-বীমা-শিল্প জাতীয়করণ ও গ্রামে ভূমি

সংস্কার, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাজে প্রদেশ ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ, সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে রোটেশন পদ্ধতিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, বিনা বিচারে আটকের আইন না করা, দেশরক্ষা বাহিনীর উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপন ইত্যাদি বিধান সংবিধানে যুক্ত করার প্রস্তাবও ছাত্র ইউনিয়ন থেকে উত্থাপিত হয়েছিল।

শাসনতন্ত্র রচনার পথ বাধাহীন করার জন্য এল, এফ, ও, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য, কাউন্সিল উত্থাপিত শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত বক্তব্য দেশব্যাপী প্রচার এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য তীব্র গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যও ছাত্র ইউনিয়ন থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলনে যোগদান

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৭১) আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় চেকোস্লোভাকিয়ার ব্রাতিস্লাভা শহরে। এই সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি নুরুল ইসলাম যোগদান করে এখানকার সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেন। বাংলাদেশের কোন ছাত্র প্রতিনিধির পক্ষে '৬০ এর পর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান ছিল এই প্রথম। এর পূর্বে কয়েকবার আমন্ত্রণ সত্ত্বেও সংগঠনের কোন প্রতিনিধি যোগ দিতে পারেন নি। সরকারী অনুমতির অভাবই এর কারণ। এবার আন্দোলনের পটভূমিতে সরকারের অনুমতি না দিয়ে কোন উপায় ছিল না। ছাত্র ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক ফোরামে তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার কারণে পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার সপক্ষে আন্তর্জাতিক ছাত্র-যুবকদের সমর্থন লাভ সহজতর হয়েছিল। সম্মেলনে বাংলাদেশের ছাত্র জনতার সংগ্রামের সাথে সংহতি ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রচার-সমাবেশ-সংগ্রাম

বিশেষ কাউন্সিল সভার পর সারা দেশে ছাত্র ইউনিয়ন কাউন্সিল সভায় গৃহীত বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। ২২ ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারের সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন ঘোষণা করে, '৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে —নইলে বাংলা স্বাধীন হবে।' বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য কোন সংগঠনের পক্ষে এটাই প্রথম ঘোষণা হিসেবে বিবেচিত হয়। '৭১ এর ২৮ ফেব্রুয়ারী ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ এর যৌথ জনসভায়ও উল্লিখিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়। কারণ একথা তখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, নতুন করে তালবাহানার জবাব একটাই—বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি।

৩ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পরপরই সারাদেশ স্বতস্ফূর্তভাবে গর্জে ওঠে। দুপুর ১টা ৫ মিনিটে বেতারে এই ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথেই ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবাদী মানুষের ঢল নামে। ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল আহবান করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়। ২ মার্চ পল্টন ময়দানে ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ জনসভায় চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য জনগণকে আহবান জানানো হয়।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে যে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন তাতে কার্যত বাঙালী জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথাই প্রতিধ্বনিত হয়। সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়—ফলে পূর্ব বাংলায় ইয়াহিয়া চক্রের নেতৃত্বের মৃত্যু ঘন্টা বেজে ওঠে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সহ সর্বত্র সংগ্রামী জনতার মহা জাগরণে স্বাধীনতা যুদ্ধের পদধ্বনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অসহযোগ আন্দোলন

ছাত্র ইউনিয়ন এই সময়ে কতগুলো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য ছিল। ৮ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন শহীদ মিনারে জনসভা করে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের সাথে সাথে দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যের গুরুত্ব, সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি, এলাকায় গণ কমিটি গঠন, স্বাধীনতার প্রশ্নে সম্রাজ্যবাদের ভুমিকা, আমাদের শত্রু-মিত্র ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য উত্থাপন করা হতে থাকে। কিন্তু একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে দেশপ্রেমিক শক্তির কার্যকর ঐক্য তখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমন কি ছাত্র সমাজের ঐক্যও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এককভাবে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এটা না করে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলে ছাত্র সমাজ তখন আরও বেশি কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারত।

সশস্ত্র প্রশিক্ষণ

মার্চের প্রথম থেকে অবস্থা যে পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, দেশ সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বিবেচনা থেকে ছাত্র ইউনিয়ন রাইফেল দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। অবশ্য বোধগম্য কারণে এগুলি ছিল ড্যামি রাইফেল। প্রতিদিন সকালে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সমবেত হয়ে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। এই প্রশিক্ষণ দেখার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হতো। সারাদেশেই ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২৩ মার্চ ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত হয় রাইফেল সহ রুট মার্চ। রাস্তার দু'পাশে লক্ষ মানুষ এই দৃশ্য অবলোকন করে এবং সারা শহরে এই ঘটনা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ছাত্র ইউনিয়নের উদ্দেশ্য সফল হয়। মানুষের মধ্যে সাহস, উৎসাহ ও ভবিষ্যতের কঠিন সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করাই ছিল এই কাজের লক্ষ্য। স্বাধীনতার সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ নিতে পারে এই লক্ষ্য নিয়ে মানুষ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকুক, ছাত্র ইউনিয়নের এই চিন্তা পুরোপুরি সফলতা লাভ করে।

পঁচিশে মার্চ

২৫ মার্চ ভোরে গোপনে খবর পাওয়া যায় যে রাতে পাক বাহিনীর বর্বর আক্রমণ পরিচালিত হতে পারে। এ সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে দেয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। মাইকযোগে শহরে এই কথা প্রচার করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পথসভা, খণ্ডমিছিল করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও পাড়ায় পাড়ায় এ খবর জানাতে চেষ্টা করে। বিকেলে শহীদ মিনারের জনসভায়ও এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কাউকে না থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

২৫ মার্চের কালো রাত। বর্বর বাহিনীর পৈচাশিক থাবার আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীর সাথে শহীদ হন ছাত্র ইউনিয়নের সুশীল, গণপতি, লুৎফুল আজীম প্রমুখ। সুখে-দুঃখে ছাত্রদের সাথে থাকতে হবে—এই চিন্তা থেকেই তাঁরা সেদিন হল ছেড়ে যাননি। ২৫ মার্চের কালোরাতের উদ্যত সঙ্গীনের মুখেও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা আপন দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি।

২৭ মার্চ কারফিউ শিথিল করা হলে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব ঢাকা শহরে কর্মীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। আগে থেকে ঠিক করা যেগোযোগ কেন্দ্র ঢাকা মেডিক্যালের আউটডোরে অনেকের সাথে যোগাযোগ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে গিয়ে অবস্থা দেখা, বিভিন্ন এলাকার খোঁজ-খবর নেওয়ার মতো কঠিন দায়িত্ব সে সময় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীরা পালন করেন।

বিধ্বস্ত ঢাকা শহরের জ্বলন্ত গহ্বর থেকে মানুষ তখন ছুটে চলেছে শহরতলী হয়ে গ্রামের দিকে। হাজার হাজার মানুষের কাফেলার সাথে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরাও অগ্রসর হন পরবর্তী করণীয় সম্পাদন করার জন্য। সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন তখন অগ্রসর হয় দেশমাতৃকার মুক্তির মিছিলে।

২৫ মার্চের পর সারা দেশে প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা হয়। বাঙ্গালী

শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-সৈনিক-পুলিশ সহ সর্বস্তরের মানুষ এতে যুক্ত হন। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরাও এই সংগ্রামে পূর্ণ উদ্যমে অংশ গ্রহণ করে। পাক বাহিনীর আগ্রাসী থাবার ছোবলে শহর-বন্দর-গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। অবাধ হত্যা-ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। লাখ লাখ দেশ-প্রেমিকের কাফেলায় ছাত্র ইউনিয়নও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে তখন অগ্রসর হয়।

স্বাধীন বাংলা সরকার

১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা সরকার শপথ গ্রহণ করে ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু হয়। এইসব ঘটনা নির্যাতিত মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণার সৃষ্টি করে। ২২ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নবগঠিত সরকারকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করেন এবং ছাত্রজনতাকে নিজ নিজ শক্তি নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। দেশে এবং বিদেশে এই বিবৃতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

সশস্ত্র সংগ্রাম

স্বাধীনতার এই প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে সামনে রেখে ছাত্র ইউনিয়ন কতগুলো সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাধারণ ছাত্র ও তরুণদের ব্যাপকভাবে ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করানোর কর্মসূচী গ্রহণ করে ছাত্র ইউনিয়ন। এই লক্ষ্যে ছাত্র তরুণদের সংগঠিত করার কাজ চালানো হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে গঠিত নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয়ার পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সাথে যৌথভাবে একটি বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠন করে। দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার কাজে এ বাহিনী এক সংগ্রামী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কুমিল্লার বেতিয়ারায় ১১ নভেম্বর (১৯৭১) এক সম্মুখ সমরে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নিজামুদ্দিন আজাদ, সিরাজুম মুনীর সহ ৯ জন শহীদ হন। হাজার হাজার মুক্তি সেনানীর গেরিলা বাহিনী গঠন করার পাশাপাশি শত্রু দখলীকৃত

অঞ্চলে ছাত্র ইউনিয়ন কতগুলো গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। এ সংগঠন শত্রু পক্ষের বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করা, মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য আশ্রয়স্থল খুঁজে বের করা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করে।

ঐক্যের প্রচেষ্টা

স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই বক্তব্য উপস্থিত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করা এবং কার্যকরভাবে অগ্রসর করার জন্য তখন সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্য ছিল অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এর গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করেননি। অবশেষে আওয়ামী লীগ, দুই ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়—যার দ্বারা জনতার মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। ছাত্র সমাজের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যও ছাত্র ইউনিয়ন প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ছাত্র লীগের একলা চলার সংকীর্ণ নীতি এ ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অবশেষে ছাত্র ইউনিয়নের প্রচেষ্টার ফলে নভেম্বর মাসে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয় মাত্র। যদি এ কাজ আগে করা যেতো এবং কার্যকর ঐক্য স্থাপিত হতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-তরুণদের অংশ গ্রহণ আরও পরিকল্পিতভাবে করা সম্ভব হতো।

আন্তর্জাতিক প্রচার

স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করানো এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মে মাসে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্ববাসীর কাছে সকল ঘটনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। এই বক্তব্য বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের ছাত্র-যুবকরা ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর কাছে ছাত্র ইউনিয়ন একটি বক্তব্য প্রেরণ

করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচার জোরদার হয় এবং বিভিন্ন দেশের ছাত্র-যুবকদের কাছ থেকে সমর্থন আসতে থাকে। সেই বিপদের দিনগুলোতে এই সমর্থনবাণীও বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সেই কষ্টকর দিনগুলোতে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র-জনতার সামনে সঠিক বক্তব্য তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়। আমাদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ শত্রু পাকিস্তানের সহযোগী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের ভ্রান্ত নেতৃত্বের স্বরূপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে মিত্র শক্তি ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ গোটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির ভূমিকা সম্পর্কেও পরিষ্কার বক্তব্য তুলে ধরা হয়। সাম্রাজ্যবাদসহ গোটা শত্রু শিবিরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মিত্রদের সহযোগিতা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করার কঠিন দায়িত্বের কথা ছাত্র ইউনিয়ন বিভিন্নভাবে ছাত্র জনতার কাছে তুলে ধরে।

মানুষের প্রিয়তম সম্পদ হচ্ছে জীবন, সে জীবনকে বাজি রেখে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীসহ লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধার আত্মাহুতি, লাখ লাখ মা বোন ও দেশবাসীর উপর নির্যাতন-এর বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বিজয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। সে বিজয়ের আনন্দঘন মুহূর্তে ঢাকায় উপস্থিত ছাত্র ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধারা বিধ্বস্ত শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ করেন।

দেশ গড়ার সংগ্রাম

স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনকে সঠিক ধারায় অগ্রসর করে নিতে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব কালবিলম্ব করেনি। ছাত্র তরুণের যে হাত একদিন চেপে ধরেছিল রাইফেলের ট্রিগার, স্বাধীনতা উত্তর নতুন পরিস্থিতিতে সে হাতই নিযুক্ত হলো দেশকে গড়ে তোলার কাজে। এই ঐতিহাসিক ও সময়োপযোগী প্রয়োজনীয়তা পুরণ করার কাজে ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রসর হয় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, ১৯৭১ এর ডিসেম্বর মাসে।

১৯৭১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান সংলগ্ন ভবনে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে ছাত্র ইউনিয়ন স্বাধীন দেশে ছাত্র সমাজের করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চাদপদ বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রের পথে গড়ে তোলার সঙ্কল্প ঘোষিত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বের কণ্ঠে। বেয়নটের ফলাকে লাঙ্গলের ফলায় রূপান্তরের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিকেও ইতিবাচক ধারায় অর্থাৎ দেশ গড়ার আন্দোলনের ধারায় প্রবাহিত করার জন্যই সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল। সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের লক্ষ্যে জনগণের আকাংখিত সার্বজনীন, গণমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি কায়েমের জন্যও ঐসময়ে দাবি উত্থাপন করা হয়।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১। সাংবাদিক সম্মেলনের ৫ দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ঢাকা শহরের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের এক বিরাট জমায়েত আহ্বান করা হয়। কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এই সমাবেশ থেকে গড়ে তোলা হয় ছাত্র ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড। ঢাকা শহরকে ৭টি

জোনে ভাগ করে ৩৫টি গ্রুপ গঠন করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আশ্রয়হীন মানুষকে পুনর্বাসিত করা, জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠন সহ বিবিধ ধারায় কাজ করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে শান্তি ও স্বস্থি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ ব্রিগেড আন্দোলন শুরু করা হয়। ১ মাসের মধ্যে ঢাকা শহরে এ ব্রিগেডের সদস্য সংখ্যা এক হাজারের বেশি হয়ে যায় এবং ৬ মাসের মধ্যে সারা দেশে দশ হাজারের উপরে ছাত্র তরুণ এ কাজে সমবেত হয়। ধীরে ধীরে এ স্বেচ্ছাসেবকরা নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে নৈশ বিদ্যালয় চালু করে। ঢাকা সহ সারাদেশে ছাত্র ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজ করতে গিয়ে অসংখ্য কর্মী কালোবাজারী-মজুতদার সহ স্বার্থান্বেষী মহলের বিরাগ ভাজন হয় এবং মিথ্যা মামলা, দৈহিক নির্যাতন সহ নানাবিধ নিপীড়নের শিকার হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও হাজার হাজার ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বেআইনী অস্ত্রধারী জনস্বার্থবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায় এবং নতুন ধারার ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। এখানে উল্লেখ্য, ছাত্র ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭২ এর প্রথম দিকেই বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দেয়।

অন্যান্য কাজ

স্বেচ্ছাশ্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কাজে ছাত্র ইউনিয়ন নজর দেয়। স্বাধীন দেশে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের প্রথম দিনটিতে শহীদ মিনারের মুক্ত আকাশের নীচে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লাখো লাখো শহীদের সংগ্রামী স্মৃতিতে নিবেদিত এই অনুষ্ঠান সেদিন হাজার হাজার দর্শক দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। খেলাধুলার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ছাত্র ইউনিয়ন অবদান রাখে। ২০ জানুয়ারী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছিল। ৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনে ছাত্র

ইউনিয়ন বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর আঁকা বিশিষ্ট শিল্পীদের ছবি দিয়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সাজানো হয়। সকাল থেকে একটানা বিশিষ্ট শিল্পীদের গান বাজানো হয়। ফলে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হয়ে ওঠে শোকাভিভূত-বেদনা বিহ্বল। ঐদিন ছাত্র ইউনিয়ন বটতলায় বিরাট ছাত্র-জমায়েতেরও আয়োজন করে।

স্বাধীন দেশে প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের সময়েও ছাত্র ইউনিয়ন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। শহীদ মিনার চত্বর এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে প্ল্যাকার্ড ও কার্ড বোর্ডের ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। শহীদ মিনারে চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। এই সব কর্ম প্রয়াসই সর্বমহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে

স্বাধীনদেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম থেকেই দাবি উত্থাপন করে। ১১ দফার আলোকে সার্বজনীন বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতির দাবি এদেশবাসীর দীর্ঘ দিনের। সেই লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন নিজ থেকেই কিছু বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই তৎ-কালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ছাত্র ইউ-নিয়ন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারী প্রথম সেমি-নার করে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এখানে সুচিন্তিত মতামত রাখেন। সবার জন্য শিক্ষা ও দেশের বাস্তব প্রয়োজনে নতুন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কমিশন পরবর্তীতে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে ও সর-কারের কাছে পেশ করে। ত্রয়োদশ সম্মেলনে এ রিপোর্ট গৃহীত হয়।

স্বাধীন দেশে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত সভায় (২০ ও ২১ জানুয়ারী '৭২) স্বাধীন দেশে ছাত্র সমাজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়, 'শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি তথা সমস্ত দিক থেকে আজ দেশকে

মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। ...গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমাজ প্রগতির পথে সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্মূল করতে হবে।' ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী অতীত বর্ণনা করে এই সভায় শাসনতন্ত্র ও শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ সভা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পুরোদমে শুরু করার পশাপাশি শহীদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নের সংগ্রামে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানায়।

জয়ধ্বনি

২৪ জানুয়ারী (১৯৭২) 'জয়ধ্বনি' নামে ছাত্র ইউনিয়নের সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। তিন বছরের মতো সময় এই পত্রিকা চালু ছিল। তিন বছরে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা শুধু ছাত্র ইউনিয়ন নয়, সমগ্র ছাত্র সমাজের মুখপত্রে পরিণত হয়। আমাদের দেশের কোন ছাত্র সংগঠনের সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ এই প্রথম। প্রথমে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ ও পরে সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম মুকুল। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস থেকে অজয় দাশগুপ্ত তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হওয়ার পর এর প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই পত্রিকা ছাত্র আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারা ও উগ্র হটকারী ধারার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে সুস্থ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

ত্রয়োদশ সম্মেলন

স্বাধীন দেশে প্রথম ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ৯, ১০ ও ১১ এপ্রিল। রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিশাল সমাবেশ। এতবড় ছাত্র সমাবেশ ইতিপূর্বে আর হয়নি। ৯ তারিখের রৌদ্র করোজ্জ্বল প্রভাতে ত্রয়োদশ সম্মেলন উদ্বোধন

করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম স্বাধীনতা ও সমাজ প্রগতির শক্তিগুলোর ঐক্য কামনা করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সমাজতন্ত্রের জন্য সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলো হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাবে, সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রাম করবে ..'। এই অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মনি সিংহ, ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ছাত্র লীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জি ডি আর, কিউবা ও ভারত থেকে আগত অতিথিরা বক্তৃতা করেন। ভারত থেকে আগত বিশিষ্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সম্মেলনে ১১ হাজার কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। শেষ দিনের র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। প্রতিদিন সন্ধ্যাতেই পরিবেশিত হয়েছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য নাট্য 'লাল গোলা-পের জন্য', রবীন্দ্রনাথের নাটক 'মুক্তধারা' এবং কলিকাতা থেকে আগত দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রের একক সংগীত ছিল মনে রাখার মত। সমাপনী দিবসে বিকেলে জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্মেলনের রাজনৈতিক ঘোষণায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ব্যাখ্যা করে ছাত্র আন্দোলনকে সমাজ বিপ্লবের অঙ্গীভূত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করে বলা হয়ঃ

'অনুকূল বিশ্ব পরিস্থিতিতে আজ আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিবার কাজ তুলনামূলক সহজতর হইয়াছে। আর এই অনুকূল বিশ্ব পরিস্থিতির পটভূমিতেই বিশ্ব বিপ্লবের স্রোতধারায় জন্ম হইয়াছে বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলিয়াছে এক বিপ্লবী প্রক্রিয়া। তাই আজ আমাদের ইস্পাতের মত দাঁড়াইতে হইবে। বিপ্লবের কর্তব্য

সমাধা করিতে হইবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সোনার বাংলা গড়িতে হইবে। কোন বাধাকে আমরা মানিবনা। সকল চক্রান্ত চূর্ণ করিব। লাখো লাখো শহীদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যাইতে দিব না। আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।' বৃহত্তম ছাত্র সমাবেশে সেদিন আরও ঘোষণা করা হয় 'দেশের স্বাধীনতাকে সংহত করতে হবে, মুক্তি যুদ্ধের পরাজিত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণকারী দেশী-বিদেশী শত্রুদের অব্যাহত চক্রান্তকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে। ...শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।...ইতিবাচক নতুন ধারার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে...।'

সাংগঠনিক বিষয়েও এই সম্মেলনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মহকুমাকে সাংগঠনিক জেলার মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ১০০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ গঠনের বিধান যুক্ত করা হয়। নতুন পরিস্থিতিতে ঘোষণাপত্র এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়, যা গৃহীত হয় পরবর্তী সম্মেলনে। এই সম্মেলনে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে সভাপতি ও আবদুল কাইয়ুম মুকুলকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

বিজয়ের কাফেলা

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত নতুন ধারার বক্তব্য নিয়ে সারাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা চালানো হয়। জেলা, থানা ও স্কুল-কলেজে ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠে। লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হয় ছাত্র ইউনিয়নের পতাকাতলে। ভাল ছাত্র, খেলোয়ার, সাংস্কৃতিক কর্মী সহ বিভিন্ন ধরনের ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হতে থাকে। ২০ মে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে এককভাবে। সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক হন মাহবুব জামান। সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ছাত্র ইউনিয়ন যথাক্রমে ১১৭৬ ও ৮৮৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল। এ ছাড়া অনেক হলেও জয়লাভ করে ছাত্র ইউনিয়ন। এ বছর

রাকসু চাকসু, ইউকসু সহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত পরিষদ জয়যুক্ত হয়।

ছাত্র লীগের বিভক্তি

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একাংশ সরকারী দল আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে থেকে যায়, বাকিরা আ. স. ম. রবের অনুসারী হিসেবে কট্টর সরকার বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে ও পরবর্তীতে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের অনুসারী হয়। ডাকসু নির্বাচনের পূর্বে জয়ধ্বনির বিশেষ সংখ্যায় এ সম্পর্কে বলা হয়, 'সামান্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহযোগী ছাত্র সংগঠন যে মর্মান্তিকভাবে ধরাশায়ী হলো আমরা এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ না করে পারি না। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চায় না যে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ আর হানাহানি চলতে থাকুক।' দুই গ্রুপ পরস্পরকে গালাগালি করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা, সমাজ প্রগতি ইত্যাদির ওপরই আঘাত করে চলে। এই পদক্ষেপের অশুভ দিকের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ঐ সংখ্যা জয়ধ্বনিতে বলা হয়, 'সব দেশেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের চক্রান্ত কার্যকরী করার জন্য একটা নীতি অনুসরণ করে থাকে—তা হচ্ছে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সুযোগ করে দেয়া...আজ ছাত্র লীগের মধ্যে বিভেদ নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীদেরই সুযোগ করে দিচ্ছে।'

আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্র লীগের মূল কথা 'মুজিববাদ'—রাষ্ট্রীয় চার নীতির বাস্তবায়ন। এই নীতির ভিত্তিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ও রববাদীদের বিরোধীতা করতে গিয়ে তারা সমাজতন্ত্র সম্পর্কেই অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, কার্যতঃ সমাজতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর বক্তব্য প্রচার করে; যেমন তাদের একটি প্রচার ছিল, 'রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই—আমাদের দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে মিলানো হবে যা দুনিয়ায় আর হয় নাই।' এই প্রচারের দ্বারা কার্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজের

গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিকাশকেই অস্বীকার করা হয়।

অপর পক্ষ 'মুজিববাদ' প্রতিহত করার জন্য 'শ্রেণী সংগ্রামের' কথা বলে এবং এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মূল্যবোধের সাথে তাদের বক্তব্য ফাঁরাক সৃষ্টি করতে থাকে। সশস্ত্র প্রতিরোধের বক্তব্যও তারা আমদানী করে এবং পরবর্তীকালে তারা উগ্র হটকারী লাইন ধরে অগ্রসর হয়।

শিক্ষা আন্দোলন

একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রাক্কালে (১৯৭২) শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে ও এর উপরের ক্লাশে ৪০% কম দামে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে শিক্ষাবছরের সাত মাস পার হওয়ার পরও স্বাধীন দেশের নতুন বই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে নাই। স্বাধীনতার কয়েকমাস পর একটি শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা বলা হলেও চেয়ারম্যান ডঃ কুদরাত-এ খুদা ও সচিব কবির চৌধুরী ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের নামই ঘোষণা করা হলোনা অনেকদিন পর্যন্ত। পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিল না করে বরং তার ভিত্তিতেই সিণ্ডিকেট গঠন করা হয়। স্বাধীন দেশে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে এলেও প্রয়োজনীয় স্কুল-কলেজের অভাবে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়। সব মিলিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত পর্বত প্রমাণ সমস্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরী হয়ে পড়ে।

ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব ছাত্র লীগের উভয় অংশের সাথে ঐক্য-বদ্ধ শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাতে সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই ছাত্র ইউনিয়ন নিজ উদ্যোগেই শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। স্কুল ছাত্রদেরকে অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা, স্বাধীন দেশের উপযোগী পাঠ্য বিষয় ঠিক করা, বিজ্ঞান ভিত্তিক সার্বজনীন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন, শিক্ষা কমিশনে ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা, পাকিস্তানী আমলের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল ইত্যাদি দাবিতে ১৯৭২ সালের ২৭ জুলাই বটতলায় ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই

সভা থেকে ছাত্র ঐক্যের আহ্বান জানানো হয় এবং ১২ আগষ্ট (১৯৭২) দাবি দিবস আহ্বান করা হয়। ৭ আগষ্ট জাতীয় পরিষদ সভায় শিক্ষা বিষয়ে ২৪ দফা দাবিনামা ঠিক করা হয়।

২৪ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২ আগষ্ট দেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাবি দিবস পালিত হয়। ২৪ আগষ্ট ও ৯ সেপ্টেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট হয়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সচিবালয় ঘেরাও করে। ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসে ২৪ দফার মূল কথা আবারও উচ্চারিত হয়: শিক্ষাকে সকলের অধিকার হিসেবে স্বাধীন দেশে স্বীকার করতে হবে, ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করতে হবে, ৫ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে ইত্যাদি।

নকল বিরোধী অভিযান

উচ্ছৃঙ্খলতা ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের প্রভাব সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও পড়ে। পরীক্ষায় নকল করা একটি গণ ব্যাধিতে পরিণত হয়। বই-খাতা দেখে প্রকাশ্যে পরীক্ষার খাতায় লেখা যেন কোন অপরাধই নয়। পরীক্ষার হলে গার্ড আছে, বাইরে পুলিশ আছে, অথচ কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কার পরীক্ষা কে দেয় তার কোন হিসেব নেই। ১৯৭২ সালে এস. এস. সি ও এইচ. এস. সি সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় এই নকল হয়। বিভিন্ন সংগঠন এই সুবিধাবাদী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও ছাত্র ইউনিয়ন এই ক্ষেত্রে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করে। ৫ ডিসেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসুর পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে পরিস্কারভাবে বলা হয় যে, 'সরকার নকল প্রতিরোধ করার কোন চেষ্টা নেয়নি—শিক্ষা কর্তৃপক্ষও এ ক্ষেত্রে নির্বিকার থেকেছেন।' নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রস্তাব করা হয় এবং ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা ও ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের যৌথ সম্মেলন করার কর্মসূচী হাজির করা হয়। সংগঠনের

কর্মীদের ওপর এই অসৎ পথ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয় এবং সাংগঠনিক ক্ষতি স্বীকার করেও এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চালানো হয়। নকল প্রবণতা ও বিনা পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভের দাবির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন জয়যুক্ত হয় ১৯৭৩ সালে। এই সময়ে নকল বিরোধী অবস্থান নেওয়ায় ডাকসু অফিস তছনছ করা হয়। আন্দোলনের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কন্‌ট্রোলার অপসারিত হন এবং সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে ও গণ নকল বন্ধ করা সম্ভবপর হয়।

সংবিধান প্রশ্নে

১৯৭২ সালের অক্টোবরে সংবিধানের খসড়া প্রকাশ করা হয়। তাড়াতাড়ি সংবিধান প্রকাশ করে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য ইতিপূর্বে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। সংবিধান প্রকাশের পর ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ঐ সংবিধানকে গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা হয়। সংবিধানকে গণস্বার্থে আরও উন্নত করার জন্য ১৬টি সংশোধনী উত্থাপন করা হয়। ১৯ অক্টোবর কেন্দ্রীয় জমায়েত ও মিছিল করে গণপরিষদে এই সব সংশোধনী পেশ করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ মৌলিক অধিকার হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, জীবন-জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের গ্যারান্টি, দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে অধিকার হিসাবে স্বীকার করা, ধর্মঘটের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা, বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা বাতিল, মহিলাদের জন্য ২০টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ভিয়েতনাম সংহতি দিবস

এ সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন বরাবরই সংহতি

প্রকাশ করে আসছে। ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ১৯৭২ এর শেষ দিকে। ২২ ডিসেম্বর বিক্ষোভ অনুষ্ঠান, ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বগ্রন্থ মেলায় মার্কিন স্টল অপসারণ করে ভিয়েতনামী স্টল স্থাপন, ২৪ ডিসেম্বর আলোচনা সভা করার পর ১ জানুয়ারী (১৯৭৩) দেশব্যাপী ভিয়েতনাম সংহতি দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। এই সময়েই অবশ্য ময়মনসিংহে ও রাজশাহীতে মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে অগ্নি সংযোগ করা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৯ বছরের জন্য লীজ নেয়া এলাকা থেকে সন্দেহজনক মার্কিনীদের বিতারণ ও চট্টগ্রামে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে ভিয়েতনাম কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

১ জানুয়ারী মিছিল বটতলা থেকে মতিঝিল যাওয়ার সময় তোপখানা রোডে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে অবস্থানরত পুলিশ কোন সতর্কতা প্রদান ছাড়াই মিছিলকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মির্জা কাদের ও মতিউল ইসলাম শহীদ হন এবং ৬ জন বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এর প্রতিবাদে ২ জানুয়ারী হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই হরতাল সমর্থন করে। ২ জানুয়ারী পল্টনের জনসভায় ৭ দফা দাবি উত্থাপন করা হয় এবং তোপখানা রোডে ভিয়েতনাম সংহতি স্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পল্টনের জনসভার দাবি : (১) ছাত্র হত্যাকারী যেই হোক না কেন তার বিচার করতে হবে, (২) হত্যাকারীকে প্রকাশ্য বিচার করে ফাঁসী দিতে হবে, (৩) বাংলাদেশে মার্কিন প্রচার ও তথ্য কেন্দ্র বন্ধ করতে হবে, (৪) সরকারীভাবে ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার নিন্দা ও মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার দাবি করতে হবে, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে হবে ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, (৫) সরকারী প্রেসনোট প্রত্যাহার করতে হবে, (৬) ছাত্র জনতার বিরুদ্ধে পুলিশ-রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া চলবেনা, (৭) শহীদ দুইজনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহীদ হিসাবে জাতীয় মর্যাদা দিতে হবে, তাদের পারিবারকে সাহায্য ও আহত-দেরকে সাহায্য দিতে হবে।

আওয়ামী লীগ-ছাত্র লীগ থেকে তখন ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ প্রভৃতি সংগঠনের অফিসে হামলা, কর্মীদের ওপর দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদি চালানো হয়। 'বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা করা হয়েছে'—এই অজুহাতে তারা ছাত্র ইউনিয়নসহ স্বাধীনতার পক্ষের সৈনিকদের ওপর হামলা অব্যাহত রাখে। এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তা চতুর্দ্দশ সম্মেলনের রিপোর্ট অনুসারে নিম্নরূপ :

'স্বাধীনতা-প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চীন মার্কিন এজেন্টদের চক্রান্ত রোধ করার জন্য, গুণ্ডাবাজী বন্ধ করার জন্য, ছাত্র-জনগণের মধ্যে ভয়-ভীতি দূর করার জন্য আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আহ্বান জানাই। সরকার ও শাসকদল এই আহ্বানের তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাদের আলোচনা হয় এবং পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।' পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতিসহ ৭ দফা দাবির কতগুলো বাস্তবায়িত করা হয়েছিল। ভিয়েতনাম সংহতি দিবসের আত্মদান বৃথা যায়নি।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর গণপরিষদে গৃহীত সংবিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়াশীল, স্বাধীনতা ও প্রগতি বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকদেরকে জয়যুক্ত করার জন্য ছাত্র জনতার প্রতি আহ্বান জানায়। নির্বাচনে শাসকদল আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৯৩টি আসন লাভ করে। শাসক দল নির্বাচনে কিছু জোর জবরদস্তি ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা না করলেও ঐ দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ হতো—এতে কোন সন্দেহ নেই। এই নির্বাচনের পরদিন গোপাল-গঞ্জের কমিউনিস্ট নেতা ওয়ালিউর রহমান লেবু, ন্যাপ নেতা কমলেশ বেদজ্ঞ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বিষ্ণুপদ ও মানিক চক্রবর্তী শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। এর প্রতিবাদে ১৯ মার্চ দেশব্যাপী শোক ও প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়েছিল।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক বিজয়ের পর দেশব্যাপী ৭০ সালের মতো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেল না। কারণ দেশজুড়ে তখন চলছে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি—অবৈধ অস্ত্রের বদৌলতে হাইজ্যাক, চুরি-ডাকাতি, খুন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও উগ্রপন্থী হটকারী অতিবামবাদীরা এই সুযোগে ভারত-সোভিয়েত বিরোধী প্রচারণায় মাঠ সরগরম করে তুলে। শাসকদলেও প্রতিক্রিয়ার দৌরাত্ম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রগতিশীল পদক্ষেপসমূহ এর ফলে মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নেওয়ার ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এপ্রিল মাসে (১৯৭৩) পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয় ঐক্যবদ্ধভাবে। ১৯৭৩ এর এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রচুর কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। ডাকসু থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে পূর্বাহ্নেই এই ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ডাকসু, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে বটতলায় ৭ এপ্রিল ছাত্রসভা হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার কথা ঘোষণা করা হয়।

২৬ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা ও প্রগতির শত্রুদের ষড়যন্ত্র নির্মূল করে প্রগতির পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস চালানোর অঙ্গীকার ঘোষিত হয় এই বিবৃতিতে। ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে দুই সংগঠনের মধ্যে সব ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ও সংঘর্ষের ইতি টেনে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে বলা হয় বিবৃতিতে।

একে অপরের নামে প্রদত্ত মামলাও প্রত্যাহারের কথা ঘোষিত হয়। এই সময়ে ফরিদপুরে ঘূর্ণীঝড় হয়। দুই সংগঠনের কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। মে মাসে দুই সংগঠনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উভয় সংগঠন থেকে ৩জন করে মোট ৬জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। জেলা পর্যায়েও পরবর্তীতে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে ওঠে। অর্থনীতিকে গড়ে তোলা, গঠনমূলক কাজ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি ও সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দাঁড় করানো, স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্ত প্রতিহত করা, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে দশ দফা কর্মসূচী প্রণীত হয়। দশ দফার ভিত্তিতে সরকারের প্রগতিশীল কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা, ছাত্র তরুণদের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা এবং স্বাধীনতা ও প্রগতি বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা ঘোষিত হয়। মে-জুন মাসে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে দুই সংগঠন থেকে ছোট ছোট টিম করে শিল্পাঞ্চল ও গ্রামে পাঠানো হয়। ৬ মে ডাকসু ৬টি ব্রিগেড পাঠায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, ঢাকার রায়পুরা, মনোহরদি, ঘিওর ও আদমজীতে। দুই সংগঠন মিলিতভাবে আরও ৬টি ব্রিগেড পাঠায় ১৯ মে। ব্রিগেড সদস্যরা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, রাস্তা ঘাট মেরামত, সাঁকো নির্মাণ, শিল্প-কৃষির, উৎপাদন বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে। তবে একটি কথা স্বীকার করাই ভালো যে, এই ব্রিগেড আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল নেহায়েতই ক্ষুদ্র কলেবরের। দেশের ব্যাপক ছাত্র-ছাত্রী ছিল এর থেকে বেশ দূরে।

জুন মাসে দশ দফার প্রচার সপ্তাহ শুরু হয়। শহীদ মিনার, বটতলা, ও বায়তুল মোকাররমে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধি নিয়ে টি. এস, সিতে সমাবেশও করা হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি বড় অবদান হচ্ছে, 'শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ছাত্র সমাজের অভিমত' নামে পুস্তিকা প্রকাশ। দুই সংগঠনের প্রতিনিধি

নিয়ে শিক্ষা বিষয়ে কতগুলো সুপারিশ প্রণয়ন করে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এই সুপারিশগুলোতে স্বাধীনদেশের উপযোগী শিক্ষানীতির রূপরেখা বর্ণনা করা হয়। শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন, বৃত্তিমূলক কর্মকেন্দ্রীক ও দেশের বাস্তব প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া, ৫ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা, শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ ব্যয় করা, শিক্ষা প্রশাসনে ও ব্যবস্থাপনা-পরিচালনায় ছাত্র প্রতিনিধি গ্রহণ করা, বাংলাকে শিক্ষার মূল মাধ্যম করা ইত্যাদি প্রস্তাব এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্য সামনে রেখেই উল্লিখিত পুস্তিকার সুপারিশগুলো প্রণীত হয়েছিল।

১৯৭৩ এর ৩ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনেও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে যৌথ প্যানেল দেওয়া হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সহ সভাপতি নূহ-উল-আলম লেনিন সহ সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এই সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনেও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৪ অক্টোবর আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। দেশে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট অবস্থান চিহ্নিত হতে থাকে।

১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসিন হলে ৭ জন ছাত্রের নির্মম হত্যার অভিযোগে ছাত্র লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান সহ কয়েকজন অভিযুক্ত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বা ছাত্র ইউনিয়নগতভাবে প্রধানের মুক্তি চাওয়ার প্রশ্নে ছাত্র লীগের সাথে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে ঐক্য অচল হয়ে যায়। কার্যত এরপর দুই সংগঠনের ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে।

দশম বিশ্ব যুব উৎসব

১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বার্লিনে দশম বিশ্ব যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগ সভাপতিকে যুগ্ম আহ্বায়ক

করে জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ব যুব উৎসবের প্রাক্কালে জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে 'সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করে সোনার বাংলা গড়ে তুলুন' এই বক্তব্যের আলোকে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় উৎসব পালন করা হয়। বার্লিন উৎসবে বাংলাদেশ থেকে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে ৮৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব সংগ্রামের সাথে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ যোগসূত্র রচনা করেন। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি এই দলের উপনেতা ছিলেন।

চতুর্দ্দশ সম্মেলন

১৯৭৩ সালের ১১, ১২ ও ১৩ নভেম্বর চতুর্দ্দশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রেসকোর্স ময়দানের বিশাল আকৃতির এই সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, চিলির মার্কসবাদী প্রেসিডেন্ট আলেন্দের মতো মৃত্যুবরণ করতে হলেও তিনি সমাজ প্রগতির জন্য লড়াই থেকে পিছপা হবেন না। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্যে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা, অরাজকতা দমন, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর জন্য ঐক্যকে আরও দৃঢ় করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে শুভেচ্ছা ভাষণ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের কোরবান আলী, ন্যাপের পংকজ ভট্টাচার্য ও কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংহ। সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া থেকে প্রতিনিধি যোগদান করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে দিনাজপুর জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়। জহির রায়হানের 'লেট দেয়ার বি লাইট' এর নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয় ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করা হয় সম্মেলনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়।

স্বাধীনতা উত্তর কালে ব্যাপক ছাত্র-ছাত্রীর সংগঠনে আগমন ও পরবর্তীতে কর্মকাজ বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে সম্মেলনের রিপোর্টে বলা

হয়, 'আমাদের প্রতি ছাত্র সমাজের ঢালাও সমর্থন ছিল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মিশ্রিত।···ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনে সংকট যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, দুর্নীতির প্রকোপ যতই প্রসারিত হতে শুরু করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মনে যতই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনেরা ততই আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে শুরু করেন।' এই সম্মেলন গত সম্মেলনে গৃহীত দেশগড়ার জন্য নতুন ধারার সংগ্রামই অনুমোদন করে। সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য এই সম্মেলনে আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলন নূহ-উল-আলম লেনিনকে সভাপতি ও মাহবুব জামানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে।

বন্যা-দুর্ভিক্ষ

১৯৭৪ সালে ঢাকা সহ সারাদেশ প্রবল বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়। সাথে সাথে শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। লাখ লাখ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। কাল বিলম্ব না করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অসহায় মানুষের পাশে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বন্যাত্রাণ ও দুর্ভিক্ষাবস্থায় পতিত মানুষকে বাঁচানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকা সহ সারাদেশে অর্থ, পুরানো কাপড়, খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে রিলিফ টিম গঠন করে এগুলো পাঠানো হয় দুর্গত অঞ্চলে। ডাকসুতে ত্রাণকাজে অংশ গ্রহণের জন্য নাম লেখানোর আহ্বান জানানো হলে দেখা গেল অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ভীড় জমিয়েছে ত্রাণ কাজে যাওয়ার মানসে।

ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের পাশাপাশি শ্রমের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা জুতা পালিশ করে এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিশি বোতল সংগ্রহ করে তা বিক্রি করার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে। এতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, রহমান হল নির্মাণে ছাত্র ইউনিয়নের শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করে যে অর্থ পায় তাও ত্রান তহবিলে

জমা দেওয়া হয়। এইসব অর্থ দিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার বন্যা কবলিত এলাকায় ছাত্র ইউনিয়নের রিলিফ টিম পাঠানো হয়।

বন্যার পানিতে ঢাকা শহর প্লাবিত হওয়ার পর ১১ দিনে ৩৫টি মেডিক্যাল টিম ২ লাখ ৩৫ হাজার মানুষকে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেয় ও বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। পানি সরে যাওয়ার পর ঢাকা শহর পরিচ্ছন্নতার কাজেও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অংশ গ্রহণ করে। ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে ২০০ গজ রেল লাইন বন্যায় ভেসে গেলে ঢাকা থেকে জমাট সিমেন্টের বস্তা পাঠানো জরুরী হয়ে পড়ে। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা রেল শ্রমিকদের সাথে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করে।

দুর্ভিক্ষের সময় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে হাজার হাজার রুটি তৈরী করা হয় মধুর কেন্টিনে ও হলগুলোতে। এছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা প্রচুর রুটি সংগ্রহ করে পাড়া-মহল্লা থেকে। এগুলি বিমান যোগে বিভিন্ন অনাহারী মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছিল। বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে লঙ্গরখানা পরিচালনায়ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অংশ গ্রহণ করে।

বন্যা উত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত ফসলের মাঠে আবার শস্য বোনা একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। মাঠ আছে কিন্তু বীজ কোথায়? ছাত্র ইউনিয়ন থেকে বীজতলা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে রেসকোর্স ময়দানে বীজতলা নির্মাণ করা হয়। ৪ একর জমি চাষ করে ২০ মণ ধানের চারা তৈরী করে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা হয়েছিল। অনুরূপ পদক্ষেপ বিভিন্ন জেলায়ও গ্রহণ করা হয়েছিল।

সংকটের আবর্তে দেশ

স্বাধীনতা উত্তর কালে বেআইনী অস্ত্রধারী ও সমাজবিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের অশুভ কার্যকলাপ, কালোবাজারী-মজুতদারদের দৌরাত্ম, রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত প্রগতিশীল পদক্ষেপ সমূহের বিরোধী দেশী-বিদেশী চক্রান্ত ইত্যাদি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তদুপরি বন্যা আর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে

বিপর্যয়ের প্রান্তসীমায় নিয়ে দাঁড় করায়। জনজীবনে নেমে আসে অস্বস্তি-হতাশা।

১৯৭৪ সালের ১১ নভেম্বর ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন রাজনৈতিক সমাবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় এবং দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির কার্যকর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই বিপর্যস্ত অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন দেশের রাজনৈতিক, সংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের আহ্বান জানায়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

দেশের 'সংকট মোকাবেলার' জন্য সরকার ১৯৭৪ এর ২৮ ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী পার্লামেন্টে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাশ করা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার চালু হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী সকল সংগঠন নিষিদ্ধ করে দেশে সাংবিধানিকভাবে একদলীয় পদ্ধতি চালু করা হয় এবং জাতীয়ভাবে একটি রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল গঠন করা হয়। নবগঠিত এই রাজনৈতিক দল ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাড়া অন্যসব সংগঠনের কাজ এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গত কারণে ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজও এ সময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

সংগ্রামের প্রশস্ত পথ

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতা দখলের পর থেকে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির ওপর গ্রেফতার-নির্যাতন নেমে আসে। ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেতা-কর্মীও এই সময়ে গ্রেফতার হন। এই প্রতিকূল পরিবেশেও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করে। ৪ নভেম্বর (১৯৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশাল মিছিল বের হয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ী পর্যন্ত যায়। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে আয়োজিত এ মিছিলে অনেক রাজনৈতিক নেতাও অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতিকূলতার সময়কালে ছাত্র ইউনিয়নের এককালীন সভাপতি ও ডাকসুর সহ-সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সহ অনেকেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জামানকে মিথ্যা মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ধরনের মিথ্যা মামলার শিকার হন অনেকে। অনেকের নামেই জারি হয় হুলিয়া, তবুও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পিছপা হয় না। নতুন কর্মসূচী নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। গ্রেফতার, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিরোধ দাঁড় করাতে চেষ্টা করে।

শ্বাসরুদ্ধকর এই দিনগুলোতে স্বাধীনতার মুল্যবোধকে উর্দ্ধে তুলে ধরা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন সকল ভয়-ভীতি, গ্রেপ্তার-নির্যাতন উপেক্ষা করে অগ্রসর হয়। ইস্পাত নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয় এবং বহু প্রচারপত্র ছাপা হয়। জেলাগুলোর সাথে গোপনে যোগাযোগ দাঁড় করানো হয়। হত্যার মাধ্যমে অবৈধভাবে

ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হন ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব।

সাংগঠনিক তৎপরতা

অবস্থার কিঞ্চিত উন্নতি হলে ১৯৭৬ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর জহুরুল হক হলে ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় পরিষদের বর্ধিত সভা আহ্বান করা হয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মাহবুব জামানের অনুপস্থিতিতে কাজী আকরাম হোসেনকে কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। ২৩ অক্টোবর সম্মেলন প্রস্তুতি পরিষদ ঘোষিত হয়। জহুরুল হক হলেই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে ৮ নং বক্‌সী বাজার লেনে কেন্দ্রীয় অফিস চালু করা হয়। কাজ কর্মের কোন পয়সা নেই—সম্মেলন হবে কি করে? এই অবস্থায় কর্মীরা এক বেলা না খেয়ে সেই অর্থ সংগঠনের তহবিলে জমা দিলেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়েই সম্মেলনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়।

পঞ্চদশ সম্মেলন

২৭ ও ২৮ নভেম্বর (১৯৭৬) লালবাগ শায়েস্তা খান কল্যাণ কেন্দ্রে সংগঠনের পঞ্চদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সম্মেলনের বিশাল জমায়েতের তুলনায় এ যেন এক 'বিন্দুবৎ' ব্যাপার। তবুও প্রতিনিধিরা বেশ উৎসাহ নিয়েই সম্মেলনের কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

'ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থই আমাদের কাছে প্রথম ও শেষ কথা' সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের এ বক্তব্যকে ভিত্তি করে সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, 'একদিকে ন্যায়ের জন্য গঠনমূলক ভূমিকা, অন্যদিকে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠা'—এই হচ্ছে ছাত্র ইউনিয়নের মূল রণধ্বনি।

ছাত্র সমাজের শিক্ষার দাবি বাস্তবায়ন, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্ত প্রতিহত করা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা, সমাজ প্রগতি বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দাঁড় করানোর প্রস্তাব পঞ্চদশ সম্মেলনে গৃহীত

হয়। এ লক্ষ্যে সংগঠনকে গুছিয়ে নেয়ার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে কাজী আকরাম হোসেনকে সভাপতি ও কামরুল আহসান খানকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদ খনন

সম্মেলনের পর পর ছাত্র ইউনিয়ন নিজ সংগঠনকে সংহত করার পাশা-পাশি গঠনমূলক কাজেও হাত দেয়। ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গনে শম্ভুগঞ্জ সেতু ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হুমকির সম্মুখীন হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে '৭৬ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে ১০০ জনের একটি টিম ভরাট নদী কাটতে যায়। পরবর্তীতে আরও একটি টিম সেখানে গিয়েছিল।

দু'টো অভিজ্ঞতা

১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ 'অপরাজেয় বাংলা'কে ভাঙ্গতে আসলে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই হামলা প্রতিহত করে। ঐ বছরই তৎকালীন সরকার নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করে। এই পে-স্কেলকে কেন্দ্র করে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার বিষয়ে পাঠরত ছাত্ররা আন্দোলনে নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজেও এ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিই থাকে।

'৭৫-এর পর, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পর, এই প্রথমবার এক প্ল্যাট-ফরমে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সমবেত হলো। যদিও এই বিষয়ে সংগ্রাম বিশেষ এগুতে পারেনি কিংবা ঐক্যও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তবুও এই ঐক্যবদ্ধ সমাবেশের প্রভাব পরবর্তী আন্দোলনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রজত জয়ন্তী

১৯৭৭ সালের ২৬ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়নের ২৫ বছর পূর্ণ হয়। প্রতিকূল

পরিবেশ সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক প্রাক্তন নেতা-কর্মী-সমর্থক উপস্থিত হন। এ উপলক্ষে গৌরবের সমাচার নামে ২৫ বছরের ঘটনা প্রবাহের উপর একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রামী ইতিহাসের উপর এটিই প্রথম গ্রন্থ। এই স্মরণীকায় অনেক প্রাক্তন ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দ স্মৃতিচারণ করেন। তারা হচ্ছেন: মোহাম্মদ ফরহাদ, মতিয়া চৌধুরী, বজলুর রহমান, পংকজ ভট্টাচার্য, সামসুদ্দোহা, নূরুল ইসলাম, মালেকা বেগম, আবদুল কাইয়ুম মুকুল, অজয় দাশগুপ্ত, নুহ উল আলম লেনিন, গোলাম আরিফ টিপু, মফিদুল হক, আবুল হাসনাত, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সৈয়দ আবদুস সাত্তার, মাহবুব জামান, এ, কে, বদরুল হক, কাজী আকরাম হোসেন, কামরুল আহসান খান ও মৃনাল সরকার। গৌরবের সমাচার সম্পাদনা করেছিলেন মনজুর আলী ননতু এবং বিশেষ সহযোগিতা দান করেন বিভুরঞ্জন সরকার।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৭৮ সালে দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায় ছাত্র ইউনিয়ন। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ওসমানীকে সম্মিলিত বিরোধী জোটের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয়। নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন অন্য ৩টি ছাত্র সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে জেনারেল ওসমানীর পক্ষে কাজ করে। জেনারেল ওসমানী জয়লাভ করতে না পারলেও নির্বাচনের কাজের ফলে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্য-বদ্ধভাবে কাজকর্ম করার প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই নির্বাচনে অবশ্য জাসদ ও তাদের অনুসারী ছাত্র লীগ পরোক্ষভাবে জিয়াউর রহমানকেই সমর্থন করে এবং ইউপিপি, ভাসানী ন্যাপ সহ পিকিংপন্থী কিছু দল ও দক্ষিণ পন্থী দল-উপদল জিয়ার পক্ষাবলম্বন করে।

বিশ্ব যুব উৎসব

১৯৭৮ এর জুলাই মাসে কিউবার রাজধানী হাভানায় বিশ্ব যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল অবস্থার কারণে বাংলাদেশ থেকে ১০ জন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার বৈধ ভিসাও, টিকেট থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত নিয়ম লংঘন করে প্রতিনিধি দলকে বিমানবন্দরে আটকে রাখে ও যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। অবশ্য জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে জাতীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা আন্দোলন

১৯৭৯ সালে টেকস্ট বুক বোর্ডের বই সরবরাহ করতে বেশ বিলম্ব হয়। শিক্ষা বর্ষ শুরু হওয়ার তিন চার মাসের মধ্যেও ছাত্ররা বই পায় না, শিক্ষা জীবনে সংকট নেমে আসে। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করে স্কুলের ছাত্রদের জমায়েত করে বোর্ড অফিস ঘেরাও করা হয়। বইয়ের দাম কমানো ও শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বই সরবরাহ করার জন্য ছাত্ররা দাবি উত্থাপন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির স্থলে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। নতুন পদ্ধতিতে ছাত্রদের নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সারা বছরই ব্যস্থ থাকতে হবে। কিন্তু হলে সকলের থাকার জন্য ব্যবস্থা হয় না, গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত বই নেই, সকলের আথিক স্বচ্ছলতা নেই। সেমিস্টার পদ্ধতির এসব পূর্ব শর্ত পূরণ করার জন্যও ছাত্র ইউনিয়ন থেকে দাবি তোলা হয় এবং সীমিত সরিসরে হলেও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অন্য সংগঠনগুলোও পরবর্তীতে অনুরূপ দাবি উত্থাপন করে।

ষোড়শ সম্মেলন

১৯৮০ সালের ৭ ও ৮ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্র ইউনিয়নের ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের কয়েকদিন আগে ১ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি কাজী আকরাম হোসেন এবং

অনেক প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তার-কৃতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এককালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, তাঁর বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহ' মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

সভাপতি সহ কয়েকজনের গ্রেপ্তার, সাধারণ সম্পাদক কামরুল আহসান খান সহ কয়েকজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি সত্ত্বেও সম্মেলনে আশাতীত জমায়েত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দাবী করেন এবং ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রামের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন সংগঠনের দাবির মুখে কাজী আকরাম মুক্তি লাভ করেন।

সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শক্তিশালী সংগঠন গড়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আবদুল মান্নান খান সভাপতি ও আনোয়ারুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ

ঐ বছর রমজানের ছুটিতে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশি-ক্ষণের কর্মসূচী নেওয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত কর্মীবাহিনী ছাড়া সুশৃঙ্খল সংগঠন কিংবা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই ছুটির সময়ে সারাদেশকে ৮টি জোনে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়নের ইতিহাস, রাজনৈতিক বক্তব্য, সাংগঠনিক কাজ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ বছর ১ হাজারের বেশি কর্মী প্রশিক্ষণ পায়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালেও অনুরূপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তদশ সম্মেলন

সপ্তদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশাল জমায়েত নিয়ে। ১৯৮২ সালের ৭, ৮ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণকালের

বৃহত্তম ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত। গত সম্মেলনের পর থেকে সংগঠনের যে সত্যিকার বিস্তৃতি ঘটেছে তার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয় এই সম্মেলন। খন্দকার ফারুক সভাপতি ও আনোয়ারুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়:

'আগামী দিনের নতুন জাতীয় জাগরণে ছাত্র সমাজ ও ছাত্র আন্দোলন যেন একটি বলিষ্ঠ ও উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে আমাদের সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে।'

নতুন ধরনের আন্দোলনের স্বরূপ প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়,

'শিক্ষা সমস্যা ও ছাত্র জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমাদের সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলবে। একই সাথে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধে, দেশের গরীব মেহনতি মানুষের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এইভাবে আগামী দিনে আমাদের সংগঠন এক নতুন ধরনের সংগ্রাম গড়ে তুলবে।'

আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাংগঠনিক করণীয় হিসেবে বলা হয়,

'আমাদের সংগঠনের অন্ততঃ দুটি শর্ত অবশ্যই অর্জন করতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের সংগঠনের জমায়েত শক্তির বিপুল বৃদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা। জমায়েত শক্তি আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করবে—আবার আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠনের জমায়েত শক্তি বাড়বে।…আমাদের সংগঠনের পরিচয় হবে ছাত্র আন্দোলনের সংগঠন।'

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উদ্যোগ

যে আশাবাদ নিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয় স্বল্পকালের মধ্যেই ছাত্র ইউনিয়ন তার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়। ২৬ মার্চ '৮২ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ অনুসারী ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ

অনুসারী ছাত্রলীগের একাংশ (ফজলু-চুন্নু গ্রুপ) সহ ৭টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। সম্মেলনের পূর্ব থেকে ছাত্র ইউনিয়ন নতুন ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে বক্তব্য প্রচার করে আসছে তার ভিত্তিতে এই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৫ মার্চ বায়তুল মোকাররমে জনসভা করার কর্মসূচীও গৃহীত হয়। কিন্তু ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারী হয়ে যাওয়ায় কর্মসূচীসমূহ সঙ্গত কারণেই স্থগিত হয়ে যায়।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

স্বাধীন দেশে দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসনের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিক্ষা দিবস ধরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ১৪ টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়। এরশাদ সরকারের পুলিশ অতীতের সব ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং ১৬ সেপ্টেম্বর মৌন মিছিল করতেও বাধা দেয়। ঐদিনের কর্মসূচী পুরো সফল করতে না পারলেও ভবিষ্যৎ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ১৬ সেপ্টম্বরের ঐক্যবদ্ধ মৌন মিছিল যথেষ্ট অবদান রাখে। আন্দোলনের প্রতি সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনের কথা প্রকাশ পায় ঐ দিন।

নতুন শিক্ষানীতি

১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান শিক্ষানীতির রূপরেখা ঘোষণা করেন। প্রথম শ্রেণী থেকে বাংলার সাথে আরবী ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এ ছাড়া দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা—অর্থাৎ এস. এস. সি. পরীক্ষা তুলে দিয়ে একবারে এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দেওয়ার বিধান হয়। নবম-দশম শ্রেণীতে সমন্বিত কোর্স প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন খর্ব করা, যারা শতকরা ৫০ ভাগ উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম রেজাল্ট খারাপ হলেও তাদেরকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া—এগুলিই হচ্ছে নতুন শিক্ষা প্রস্তাবের মর্মকথা।

উল্লেখিত গণবিরোধী বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করে শিক্ষা বিষয়ে ছাত্র আন্দোলন শুরু করতে ছাত্র সংগঠনগুলো একতম হয়। পত্রিকায় বিবৃতি পাঠানো হয়। শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তরফ থেকেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে।

তারপর ? তারপর কি করা এই নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কতগুলো বক্তব্য রাখা হয়। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের যোগাযোগের বাইরে অবস্থান করছে। তাই প্রথমতঃ এদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার, এর জন্য শিক্ষাবিষয়ক দাবিনামা রচনা করে ছাত্র-ছাত্রী-দের কাছ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে প্রাথমিক কাজ। দ্বিতীয়তঃ এসব দাবীর উপর ভিত্তি করে প্রচারপত্র, পোস্টার, ছাত্র সভা ইত্যাদি দিয়ে পরিস্থিতিকে পরিপক্ক করে তুলতে হবে। তৃতীয়তঃ পরিস্থিতি কিছুটা পরিপক্ক হলে দাবি দিবস, প্রতিবাদ দিবস, ছাত্র ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচী অহ্বান করা। উল্লিখিত কর্মসূচী পালন করতে করতে ছাত্র সমাজ আন্দোলনে কিছুটা অভি-জ্ঞতা অর্জন করবে। এই সময়ে সামরিক আইন উচ্ছেদের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ ও অন্যান্য গণসংগঠন তাদের দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করলে একযোগে রাজপথে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম শুরু করা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া। ছাত্র ইউনিয়ন এভাবে আন্দোলদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রথম কাজটি করার অর্থাৎ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার প্রস্তাব করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেদিন অনেকেই এ কাজটির মধ্যে কোন 'আন্দোলন' দেখতে পাননি—তাই একে 'অবিপ্লবী' বলে দূরে ঠেলতে চেয়েছেন। ছাত্র ইউনিয়ন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে দেশ-ব্যাপী এ কাজটিকে পরিচালনা করে। এর ফলে সাধারণ ছাত্রদের সাথে আন্দোলনের যোগসূত্র রচিত হয় যা পরবর্তীকালে খুবই কার্যকর ফল বয়ে আনে।

১৪ ফেব্রুয়ারী : ১৯৮৩

কিন্তু অবস্থা পরিপক্ক হওয়ার আগেই রাজপথের কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারীতে স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্র মিছিল সচিবালয়ের দিকে যায়। হাইকোর্টের মোড়ে মিছিলের ওপর টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ ও গুলি চালানো হলো জয়নাল, মোজাম্মেল সহ বেশ কজন শহীদ হন। বিকেলে শোক মিছিলের প্রস্তুতিকালে ইতিহাসের বর্বরতম পুলিশ নির্যাতন হয় বটতলায়—কলা ভবনে। কয়েক হাজার ছাত্রকে গ্রেফতার করে জঘন্য কায়দায় নির্যাতন করা হয়। ছাত্রীরাও এ নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। সন্ধ্যা ৬ টায় কারফিউ দিয়ে হলে হলেও চালানো হয় নির্যাতন। ১৫ তারিখ হরতাল আহবান করা হয়। সেদিন ঢাকা ও চট্টগ্রামে শহীদ হন কয়েকজন। রাজনেতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়।

এর পর পর দু'একটি সংগঠনের তরফ থেকে হঠকারী ও অবাস্তব কর্মসূচী গ্রহণের ঝোক দেখা যায়। কিন্তু তা প্রতিহত করে আন্দোলনকে বাস্তব সম্মত পথে পরিচালনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়ন থেকে এই দুঃসময়ে পরিকল্পনা নিয়ে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হয়। ৬ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শোক দিবস পালিত হয়। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ঘোষিত হয় ঐতিহাসিক দশদফা কর্মসূচী।

রাজনৈতিক ঐক্য

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোও ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয় এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সহ ৫ দফা দাবী উত্থাপিত হয়। শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দোলনে নামে। ১৯৮৩-এর ১ নভেম্বর পালিত হয় সফল হরতাল। ২৮শে নভেম্বর অবস্থান ধর্মঘটে গুলি হয়। শহীদ হন কয়েকজন। ২৮ ফেব্রুয়ারী, (১৯৮৪) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয় সেলিম ও দেলোয়ারের মতো দুই সংগ্রামী যোদ্ধাকে। ১ মার্চ আবার হরতাল। সেদিন শহীদ হন প্রাক্তন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও আদমজীর শ্রমিক নেতা

তাজুল ইসলাম। সরকারের ঘোষিত অসাংবিধানিক উপজেলা নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ২৭ আগস্ট হয় আবার হরতাল। ২৭ সেপ্টেম্বর পুর্ণ দিবস হরতাল ও ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় লাখ লাখ মানুষের জাতীয় সমাবেশ। সরকার বাধ্য হয় নতি স্বীকার করতে। রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করা হয়। আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় সুচিত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

শাহাদাত হত্যা

১৯৮৪ সালের ২৮ মে চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা শাহাদাত হোসেন স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়। শাহাদাত হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদগতভাবে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এবং ছাত্র ইউনিয়ন দেশব্যাপী শোক দিবস পালন করে। পনের দলের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। শাহাদাত হত্যার আসামীদের পরবর্তীকালে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়।

অষ্টাদশ সম্মেলন

১৯৮৪ সালের ২১ ও ২২ অক্টোবর সংগঠনের অষ্টাদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। একদশক কালের মধ্যে এতবড় সংগঠিত ছাত্র জমায়েত ঢাকা শহরে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। বিশ হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি-পর্যবেক্ষক যোগ দেয় সম্মেলনে। কলাভবনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, ৫৫ মিনিট স্থায়ী সংগঠনের ইতিহাস ভিত্তিক গীতি আলেখ্য। নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ৫২ থেকে ৮৪ সাল পর্যন্ত সময়কালের মুল মুল ঘটনাবলীর উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে দর্শকরা মোহিত হয়ে যায়। দর্শকদের মতে খোলা আকাশের নীচে খরতাপের মধ্যে এই ধরনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করা ছাত্র ইউনিয়নের মতো সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব। সম্মেলনের

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন করেন শহীদ তাজুলের স্ত্রী নাসিমা ইসলাম।

২১ অক্টোবর বিকেলে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে ছাত্র ইউনিয়নের বিশিষ্ট প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, ন্যাপের আহমেদুর রহমান আজমী, শ্রমিক নেতা সামসুদ্দোহা, ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কৃষক সমিতির নূহ উল আলম লেনিন, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম ও যুব ইউনিয়ন সভাপতি আবুল কাশেম।

সম্মেলনের প্রথমদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন জেলায় সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হয় 'আমরা চলি অবিরাম' নৃত্যালেখ্য। সম্মেলন উপলক্ষে শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের ওপর আলোক চিত্র, পোস্টার ও কার্টুন প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলণে আনোয়ারুল হককে সভাপতি ও তাহের উল্লাহকে সাধারণ সম্পাদন নির্বাচন করা হয়।

ছাত্র ইউনিয়নের অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পটভূমিতে। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে বলা হয়: 'দেশের বুকে চলে আসা হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের ধারার বিপরীতে সামরিক শাসনের অবসান ও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।' এই লক্ষ্যে জাতীয় দাবি ৫ দফার ভিত্তিতে অবিলম্বে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন দাবি করা হয়। আশু কর্তব্য হিসেবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রাখা এবং চূড়ান্ত করণীয় হিসেবে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে বেগবান করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে ও সম্মেলণের মূল শ্লোগানের মধ্য দিয়ে।

সম্মেলন উত্তর পরিস্থিতি

অষ্টাদশ সম্মেলনের প্রাক্কালে ১৪ অক্টোবর পনের দলীয় জোটের উদ্যোগে

শেরে বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহা সমাবেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের দাবি, জাতীয় করণ, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি সহ একুশ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এই দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ৮ ডিসেম্বর ২৪ ঘন্টার হরতাল পালিত হয় সফলভাবে। ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালিত হয় শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ডাকে ও রাজনৈতিক শক্তির সমর্থনে। আন্দোলনের চাপে সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি মানতে ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় এবং জনদলীয় মন্ত্রিসভা বাতিল করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক আইন বহাল রেখে নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করে। এই সুযোগে ১ মার্চ, ১৯৮৫ সরকার সামরিক আইনের ধারা সমূহ পুরোপুরি আরোপ করে যেটুকু রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাও কেড়ে নেয়। সামরিক আইনের কঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে বিতর্কিত উপজেলা নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠান করে নেয়া হয়। ফলে সমগ্র পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যায়। নির্বাচনের মাধ্যমে স্বৈরশাসনকে হটিয়ে দেওয়ার যে পরিস্থিতি দেশে সৃষ্টি হয়েছিল এভাবেই তা নষ্ট হয়ে যায়। জনমনে নামে হতাশা।

২৪ মে ঘূর্ণিঝড়

১৯৮৫ এর ২৪ মে প্রলয়ংকরী ঘুর্নিঝড়ের ছোবলে দেশের উপকূলীয় আঞ্চলের সিংহবাগ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের দুর্গত অঞ্চলে ছাত্র ইউনিয়ন রিলিফ টিম প্রেরণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ অসংখ্য নেতা ও কর্মী দীর্ঘদিন পর্যন্ত ত্রাণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ত্রাণকাজে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বিজয় কুমার বনিক মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি সাহায্যের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়ন স্কুল ছাত্রদের মাঝে বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদিও বিবরণ করে।

দ্বাদশ বিশ্ব ছাত্র যুব উৎসব

১৯৮৫ সালের ২৭ জুলাই থেকে ৩ আগষ্ট মস্কোতে দ্বাদশ বিশ্ব ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের প্রাক্কালে ১৯৮৪ সালের শেষ দিকে জাতীয়ভাবে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়নসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে। প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ এর মার্চ মাসে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় কর্মসূচী পালনের কর্মসূচী থাকলেও দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা পালন করে সম্ভব হয়নি। ২৭ জুলাই উৎসবের উদ্বোধনী দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর পাশের প্রাঙ্গনে জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে এক সমাবেশ ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে যোগদানেচ্ছু প্রতিনিধিদের উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সরকার।

উচ্চ মাধ্যমিক ক্যাম্প

১৯৮৫ সালের ৯ ও ১০ অক্টোবর ছাত্র ইউনিয়ন উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পের আয়োজন করে। সারা দেশের উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীদের এই জমায়েতে শিক্ষা সমস্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবং তাদেরকে ঢাকার দর্শনীয় স্থান সমূহও দেখানো হয়। ১৯৮৬ সালে অনুরূপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডি

১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলের অনুপ দ্বৈপায়ন ভবনে (সাবেক পরিষদ ভবন) অবস্থিত হল মিলনায়তনের ছাদ ধ্বসে পড়লে ৩৭ জন মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান ও আহত হন শতাধিক। নিহতদের মধ্যে শৈশব রায় সহ বেশ কয়েকজন ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যও ছিলেন।

এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির সময়ে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা দৃঢ়তার সাথে

পরিস্থিতি মোকাবেলা করে। নিহতদের লাশ বাড়ি পাঠানো, আহতদের সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহ যাবতীয় কাজে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্লান্তভাবে অংশ গ্রহণ করে।

অস্ত্র মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের জন্য আন্দোলন : ১৯৮৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পায় মারাত্মকভাবে। এই অস্ত্রধারী মাস্তানদের অনেকেই সরকারী মদত প্রাপ্ত। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের উদ্যোগে পাহারা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে ছাত্র ইউনিয়ন। দলীয় ভাবেও এই সময়ে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার প্রচেষ্টা হয়। ১৪৪ দিন বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে আগষ্টে (১৯৮৫)। ৫ আগষ্ট বটতলার ছাত্র সভায় ছাত্র ইউনিয়ন অস্ত্র আর সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানায়। ১৯৮৫-এর ৬, ৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদ সভায়ও শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হক বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার আহ্বান জানান। ছাত্র ইউনিয়ন আন্তরিক ভাবেই এই আহ্বানকে কার্যকর করার জন্য সক্রিয় অবদান রাখে।

মাননীয় উপাচার্য অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করতে পারেননি। এক অসহায় অবস্থার শিকার হয়ে তিনি নিজেই ১৯৮৬-এর ফেব্রুয়ারীতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতা ও কর্মীকেও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে, ভোগ করতে হয়েছে নির্যাতন। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, সংগ্রামে ও নীতিতে অটল থেকেছেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৮৬ সালে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। পনের দলীয় জোট নির্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে স্বৈরা-

চারকে পরাজিত করার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু সাত দলীয় জোট এবং পনের দলের অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি ছোট দল ও দলাংশ নির্বাচন না করার নীতি নেয়। নির্বাচন প্রশ্নে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

নির্বাচনী সংগ্রামে অংশ নিয়ে স্বৈরাচারকে পরাভূত করে দেশে ষড়যন্ত্র আর হত্যার রাজনীতির বিপরীতে নিয়মতান্ত্রিক-সাংবিধানিক শাসনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ওপর ছাত্র ইউনিয়ন গুরুত্ব আরোপ করে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর ৩০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলের ওপর নির্বাচন বিরোধী গোষ্ঠী সশস্ত্র হামলা চালায়। এই হামলায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ঢাকা নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের ছাত্র মাজহারুল হক আসলাম নিহত হন। আসলাম হত্যার প্রতিবাদে ২ এপ্রিল দেশব্যাপী শোক দিবস পালিত হয়। পনের দলের পক্ষ থেকেও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ পনের দলের পক্ষেই রায় প্রদান করে। কিন্তু সরকার ব্যাপক কারচুপি, ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচনী করে। রায়কে তাদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এত কিছুর পরও সরকারী দল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পনের দল ৯৭টি আসন পায়।

রুবেল হত্যা

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলনে বাসদের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীর হামলায় আহত হয়ে উপজেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ময়নুল আখতার রুবেল ১২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। রুবেল হত্যার প্রতিবাদে সংগঠনের উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

ঐতিহাসিক ভাষা-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে ওঠা সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই ছাত্র সমাজের স্বার্থে তথা দেশবাসীর স্বার্থে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। লড়াই-সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ছাত্র ইউনিয়ন কখনই ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করেনি। আপোষ-ষড়যন্ত্রের বা সুবিধাবাদের চোরা পথে পা দেয় নি। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের এ-কথা জানা যে সমাজ রূপান্তরের কোন সহজ পথ নেই। এই পথ বন্ধুর, তাই বলে পথ চলায় বিরাম নেই। চলতে চলতে অভিজ্ঞতা বাড়ছে, দৃঢ়তর হচ্ছে লক্ষ্য পূরণের অঙ্গীকার।

—

পেছনে ফেলে আসা সংগ্রামী ঐতিহ্য

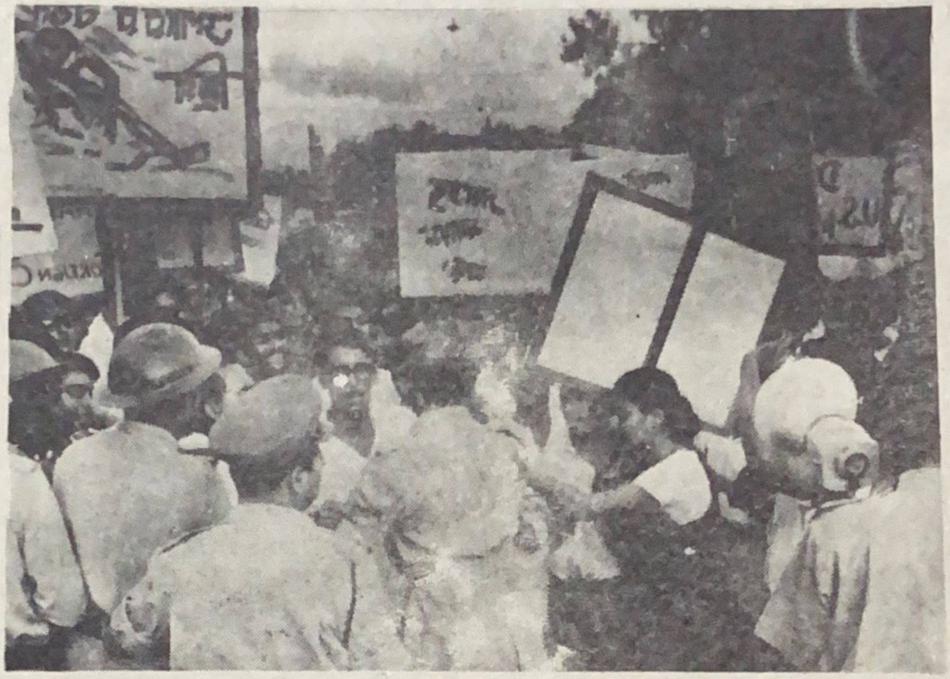

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে বাধা দিচ্ছে পুলিশ ঃ বেষ্টনী ভেঙ্গে অগ্রসর হতে চাইছেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব। ছবিতে বেগম মতিয়া চৌধুরিকে দেখা যাচ্ছে

দশম সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন মনোরমা বসু মাসিমা

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় বটতলার একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র প্রস্তুতি ঃ ১৯৭১ এর মার্চ মাসে ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের ড্যামি রাইফেল হাতে রুটমার্চ

ছাত্র ইউনিয়ন-ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির যৌথ গেরিলা বাহিনীর অস্ত্র-জমাদান। অস্ত্র জমা দিচ্ছেন ছাত্র ইউনিয়নের মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ন্যাপের পংকজ ভট্টাচার্য ও কমিউনিষ্ট পার্টির ওসমান গণী।

বঙ্গবন্ধুর সাথে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ : ১৯৭২

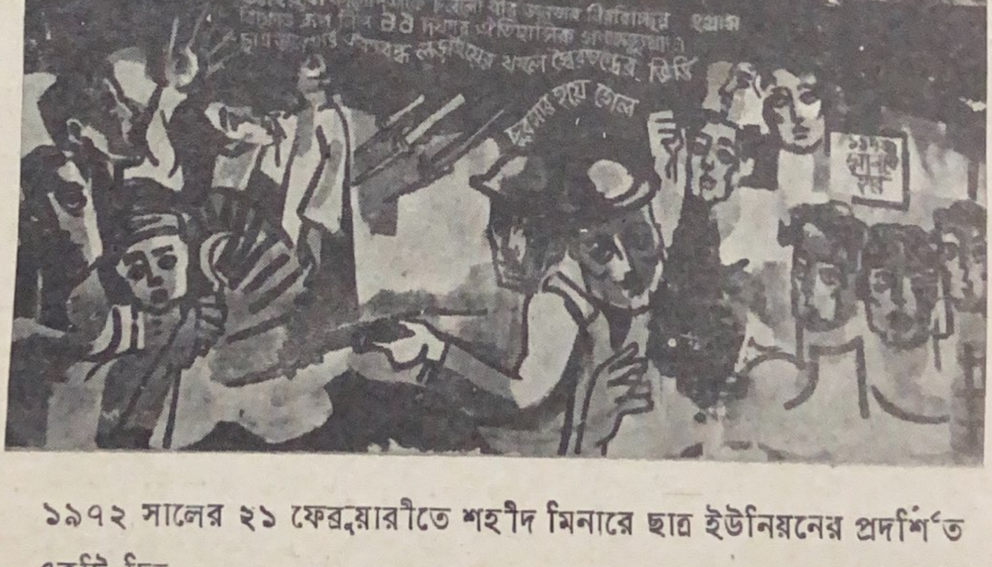

১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের প্রদর্শিত একটি চিত্র

শহীদ মতিউল-কাদের স্মৃতি সৌধ ঃ ১৯৭৬ সালে ভেঙ্গে ফেলার আগে তোলা ছবি

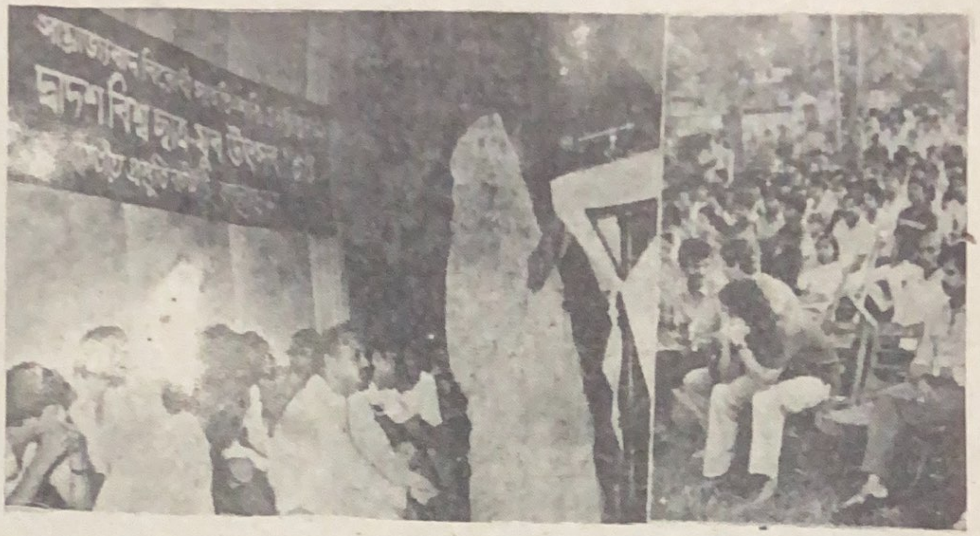

দ্বাদশ বিশ্ব ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা করছেন বেগম সুফিয়া কামাল

সপ্তদশ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জমায়েতের একাংশ

ছাত্র ইউনিয়নের ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মিছিল ঃ ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৪

ছাত্র ইউনিয়নের শান্তি মিছিল

বায়তুল মোকাররমে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় বক্তৃতা করছেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তাহের উল্লাহ

১৯৮৩ সালের ১৪, ১৫ ফেব্রুয়ারীর শহীদদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় আয়োজিত গায়েবানা জানাজা

অষ্টাদশ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন

রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মিছিল ঃ ১৯৮০

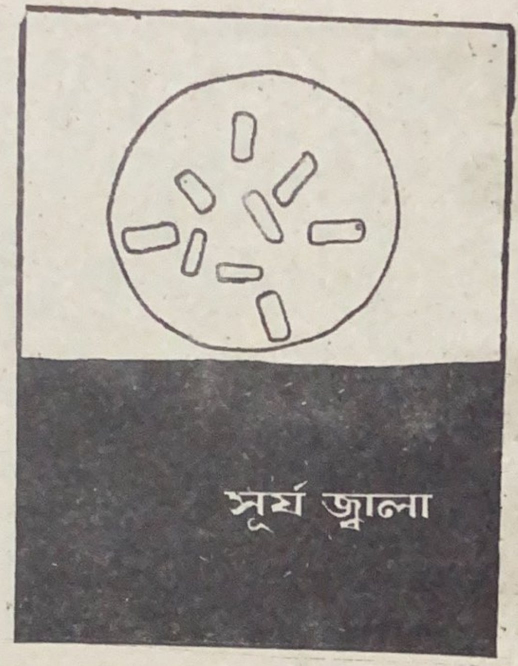

☐ প্রচ্ছদ 'সূর্য জ্বালা'।। একুশের সংকলন, ১৯৬৭।। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।। সম্পাদনা ঃ আবদুল হাসনাত।। প্রকাশনা ঃ হিলাল উদ্দিন।। মূল্য ঃ পঞ্চাশ পয়সা।।

এই সংকলনে লিখেছেন ঃ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ, কাজী জামান হোসেন, মালেকা বেগম, ডঃ আনিসুজ্জামান, আবদুল হালিম, শুভ রহমান, আলী হায়দার খান, কাজী শওকত আনোয়ার, আখতার হুসেন, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবু আহমেদ চৌধুরী, মুনীরুজ্জামান, হিলাল উদ্দিন, মিলন দত্ত, মাহমুদ আল জামান ও আলী আহমদ।

১৯৬৬ সালের সম্মেলনের রিপোর্টের প্রচ্ছদ

জয়ধ্বনি

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র

ডি-এ ১৭০ ঢাকা : ১৮ই মে ১৯৭২ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনী বিশেষ সংখ্যা

ছাত্রলীগ ভেঙ্গে গেল

বাংলাদেশ ছাত্রইউনিয়নকে আজ একক দায়িত্ব নিতে হবে

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। পুরাতন ছাত্রলীগ ভেঙ্গে গেছে। জাতীয়তাবাদের পতাকা হাতে নিয়ে বিগত কয়েক ছাত্র সমাজের ঐক্যের নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। তাই সারান্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহযোগী ছাত্র সংগঠন যে মর্মান্তিক ভাবে করা এবং সমাজতন্ত্রের পথে সার্থক বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে সকল নিজের দলের ঐক্য আজ আর বজায় রাখতে পারল না। দল ভেঙ্গে উপদলে বিভক্ত হল।

বিভেদেই শেষ নয়। ছাত্রলীগের দুই উপদল যার যার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে এমনসব রাজ- দিয়ে একথাই প্রমাণ করলেন যে আজ বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করার জন্য ঐতিহ্যশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নেতৃত্ব করার যোগ্যতা তাদের নেই। কারণ তারা দেশের স্বার্থ,

মুজাহিদুল ইসলাম খান (সেলিম)। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রইউনিয়নের সভাপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের শেষ পর্ব এম, এ, ক্লাশের ছাত্র, এক দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা, বহুগুণে সমন্বিত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, এক অনন্য প্রতিভা। এবারের ডাকসু নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী।

মাহবুব জামান। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষ বি, এ, সম্মান (পুরাতন) ক্লাশের ছাত্র। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক।

স্কুল জীবন থেকেই এক কৃতী ছাত্র ও দক্ষ সংগঠক। একজন আদর্শ গেরিলা যোদ্ধা। ডাকসু সাধারণ সম্পাদক পদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মনোনীত প্রার্থী।

ডাকসু নির্বাচন, ১৯৭২ উপলক্ষে জয়ধ্বনি বিশেষ সংখ্যা

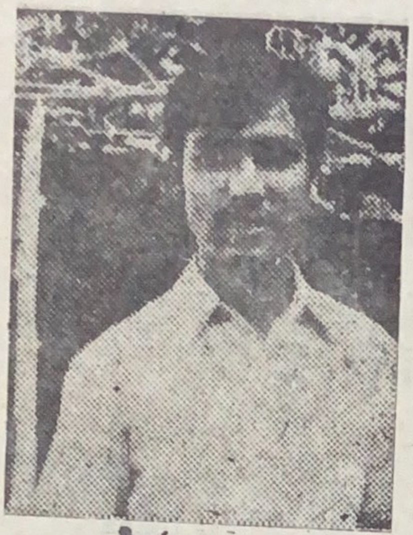

মীর্জা কাদের

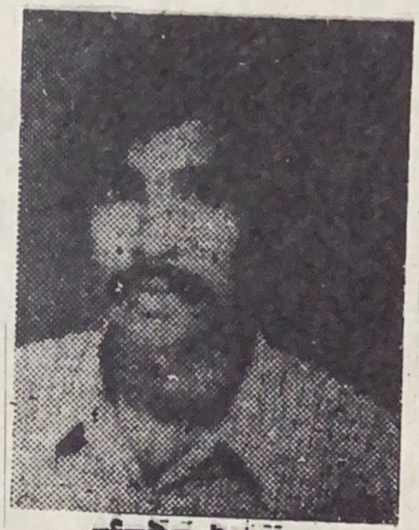

মতিউর ইসলাম

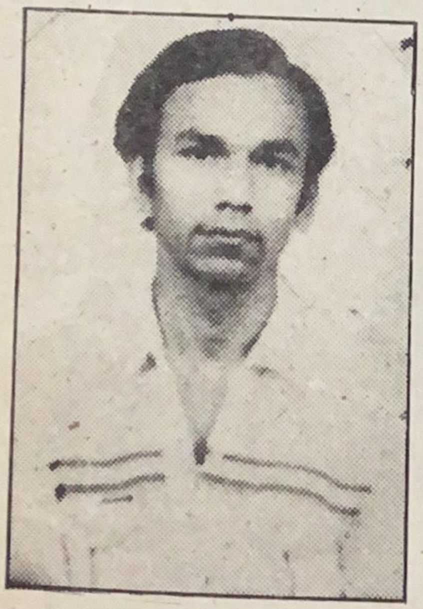

তাজুল ইসলাম

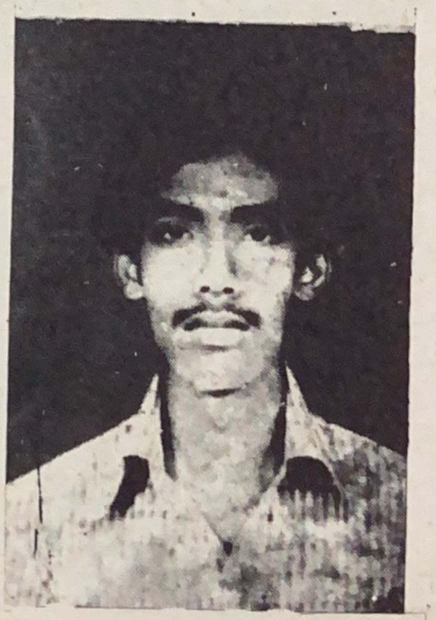

মাজহারুল হক আসলাম

□ প্রচ্ছদ 'প্রতিধ্বনি'।। একুশের সংকলন।। ১৯৬৪।। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।। সম্পাদনাঃ সাইফউদ্দিন আহাম্মদ মানিক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক।। প্রকাশনায়ঃ জামাল আনোয়ার বাসু, প্রচার সম্পাদক, ৩১, হোসেনী দালান রোড, ঢাকা।। মূল্যঃ পঁচিশ পয়সা।।

এই সংকলনে লিখেছেনঃ রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, আনোয়ার জাহিদ, আহমেদুর রহমান, ফয়েজ আহমদ, আবু নাহিদ, শামিম জামান, সৈয়দ আবদুস সামাদ, মসুদ আহমেদ, শুভ রহমান, শহীদুর রহমান, মতিউর রহমান, মাহমুদ আল জামান, দিলারা আহমেদ, জসীম উদ্দীন, আবদুল লতিফ ও আবদুল করিম।

রজত জয়ন্তীতে (১৯৭৭) প্রকাশিত 'গৌরবের সমাচার' এর প্রচ্ছদ

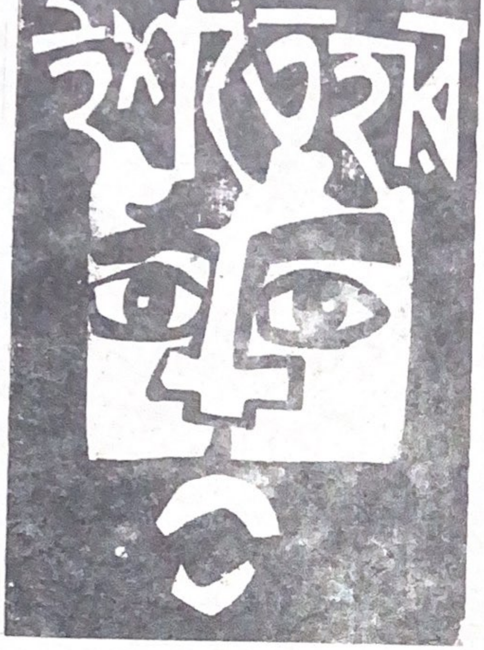

- প্রচ্ছদ—'ইশতেহার'।। একুশের সংকলন, ১৯৭১।। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।। সম্পাদক : মোস্তফা ওয়াহিদ খান।। প্রকাশক : এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর।।

  লেখক : শামসুর রাহমান, মুজাহিদুল ইসলাম, শেখর দত্ত, রণেশ দাশ গুপ্ত, আল মাহমুদ, মাহমুদ আল জামান, অরূপ তালুকদার, কাজী হাসান হাবিব, মাসুদ আহমেদ মাসুদ, সিকান্দার আবু জাফর, দীপক জ্যোতি আইচ, বদরুদ্দোজা বাচ্চু, মনজুরুল হক, খান মোহাম্মদ ফারাবী, আজিজুল হক ও আজমিরী ওয়ারেস।

- প্রচ্ছদ 'অরনি'।। একুশের সংকলন, ১৯৬৮।। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।। সম্পাদক : আবুল হাসনাত।। প্রকাশনায় : হিলাল উদ্দিন।। লেখক : অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সন্তোষ গুপ্ত, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আজমল খাটক, আখতার হুসেন, বেবী মওদুদ, মাসুদ আহমেদ মাসুদ, মুরশেদ নুর শাহরিয়ার, কাজী হাসান হাবিব, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হাসান, মাহমুদ আল জামান, জহীর রায়হান ও অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ।

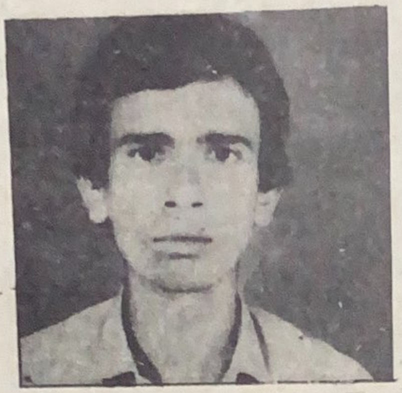

ময়নুল আখতার রুবেল

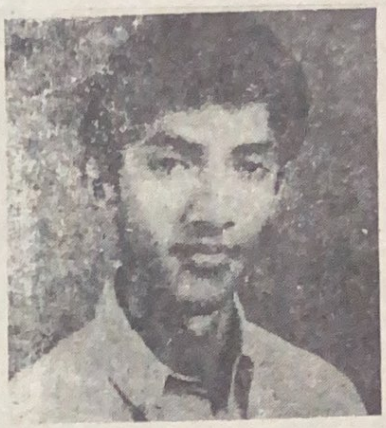

নিজামুদ্দিন আজাদ

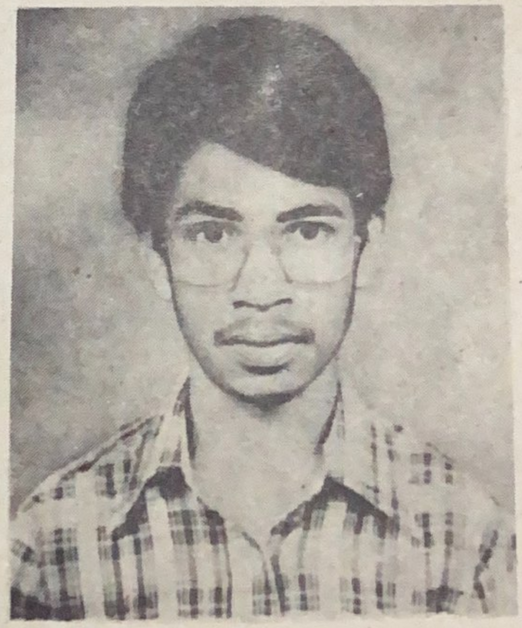

শাহাদাত হোসেন